যতীন্দ্রমোহন
কবি ও কাব্য

কলিকাতা স্কটিশচার্চ কলেজের বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপক
শ্রীঅলোক রায় এম. এ.
প্রণীত

সাহিত্য প্রকাশ
৪২/২, রমেন্দ্রপ্রসাদ মজুমদার লেন,
হাওড়া

প্রকাশক :
শ্রীমিতা দেবী
৪৭/২, রমেন্দুপ্রসাদ মজুমদার লেন
হাওড়া

প্রথম সংস্করণ
অগ্রহায়ণ
১৩৬১

প্রচ্ছদ :
শ্রীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

বিক্রয়কেন্দ্র :

লিপিকা
৩০/১ কলেজ রো
কলিকাতা-৯

দে বুক স্টোর্স
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট
কলিকাতা-১২

মুদ্রক :
শ্রীপরেশচন্দ্র ভাওয়াল
মুদ্রণ ভারতী (প্রাঃ) লিমিটেড
২, রামনাথ বিশ্বাস লেন।
কলিকাতা—৬

নিবেদন

রবীন্দ্রযুগের বিশিষ্ট কবি যতীন্দ্রমোহন বাগ্‌চী। একদা জনপ্রিয়, আজ বিস্মৃতপ্রায়। তবু আলোচনার প্রয়োজন আছে, প্রয়োজন আছে কবিকে ও তাঁর কাব্যকে জানার। কাব্যের সত্যমূল্য কখনো হারিয়ে যেতে পারে না, আলোছায়ার খেলায় কখনো প্রচ্ছন্ন হয় মাত্র। কবিতা ভালোবাসি এবং ভালোবাসি বলেই কবিতা পড়ি, আলোচনা করি, অনুভবে এবং বিশ্লেষণে কবিতাকে সম্পূর্ণ করে তুলি। যতীন্দ্র-মোহনের যে স্বীকৃতি প্রাপ্য ছিল, তা তিনি পাননি। যতীন্দ্রমোহনের কবিতা পড়তে গিয়ে এই সত্যই নূতন করে আবিষ্কার করলুম। এবং শুধু কবিতা নয়, কবিও আমাদের অজ্ঞাত, অপরিচিত। সাহিত্যের ইতিহাসে এই জাতীয় অসম্পূর্ণতা বিভ্রান্তিকর। বর্তমান গ্রন্থটি যতীন্দ্র-পরিচয় হিসাবে অনেকগুলি প্রয়োজন সিদ্ধ করবে।

কবি যতীন্দ্রমোহনের পরিচয় দিতে গিয়ে তাঁর যুগ-কালেরও পরিচয় দিতে হয়েছে। 'সাহিত্য', 'ভারতী', 'মানসী'র ফাইল এখনো দুষ্প্রাপ্য হয়নি, কাজেই যতটা সম্ভব তার সদ্ব্যবহার করা গেল। বিশ শতকের প্রথম তিন দশকের কবিতার ইতিহাসও তাই বর্তমান গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হলো।

কবির জীবনী রচনায় অসহায় বোধ করেছি। তথ্যের বিস্ময়কর অভাব পদে পদে বাধা সৃষ্টি করেছে। সাধ্যমত যোগাযোগ করেছি, সম্ভাব্য সকল স্থান থেকেই তথ্যসংগ্রহের চেষ্টা করেছি। কবির পুত্র-বধূ শ্রীযুক্তা শচীরাণী বাগ্‌চী এবিষয়ে যথেষ্ট সাহায্য করেছেন।

অধ্যাপক ডঃ হরপ্রসাদ মিত্র এই গ্রন্থের সুচিন্তিত মুখবন্ধ লিখে দিয়ে আমার প্রতি স্নেহানুকূল্য দেখিয়েছেন। কবিশেখর কালিদাস রায়, কবি নরেন্দ্র দেব এবং শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত সরকার (পণ্ডিচেরী)

যতীন্দ্রমোহন সম্পর্কে বহু তত্ত্ব এবং তথ্য দান করেছেন। শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র সাধু, এম-এ, যতীন্দ্রমোহন-সংবর্দ্ধনা পুস্তিকাটি সংগ্রহ করে দিয়েছেন। এঁদের সকলের সহায়তা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্বীকার করছি।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সনৎকুমার মিত্র এম-এ, গ্রন্থের পরিকল্পনা থেকে সুরু করে মুদ্রণকার্য পর্যন্ত যাবতীয় স্তরে অশেষ প্রকারে সহায়তা করেছেন। কল্যাণীয় শ্রীমতী আলো বসু বি-এ, প্রেস-কপি তৈরীর কাজে সাহায্য করেছেন। এঁদের সকলকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

অলোক রায়

মাতামহ

স্বর্গত মন্মথনাথ ঘোষ—

স্মৃতির উদ্দেশে

বিষয়-পরিচয়

মুখবন্ধ

বাংলায় রবীন্দ্র-যুগ এক বিস্তীর্ণ অধ্যায়। রবীন্দ্রনাথের প্রথম সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠার অধ্যায় যদি উনিশ-শতকের শেষ দশকে ঘটেছিল বলে ধরা যায়, তাহলে বাংলা সাহিত্যের আসরে তাঁর অনুরাগী অনুজ লেখকদের প্রবেশ ও নিষ্ক্রমণের ধারা তখন থেকেই শুরু হয়েছে বলতে হবে। মোটামুটি হিসেবে, ১৮৮০ থেকে যে দশকের সূচনা, সেই দশকে রবীন্দ্রনাথের কাব্য-সাধনার কর্মব্যস্ত শিক্ষানবিশি-পর্ব উদ্‌যাপিত হয়েছে। ১৮৯০-এ তাঁর 'মানসী' বইখানি ছাপা হয়। তখন থেকে একে-একে রবীন্দ্র-কাব্যধারার অপেক্ষাকৃত গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণগুলি প্রকাশিত হতে থাকে। 'সোনার তরী', 'চিত্রা', 'ক্ষণিকা', 'কল্পনা', 'নৈবেদ্য' ইত্যাদি কাব্যরচনাবলীর পাশাপাশি তাঁর গদ্যচর্চার এবং নাট্যচর্চার ধারাও প্রবাহিত হয়ে এসেছে। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর প্রভাবেরও বিস্তার ঘটেছে।

এই রবীন্দ্রপ্রভাবপুষ্ট কবি-সাহিত্যিকদের পর্যায়-বিশ্লেষণ আমাদের সাহিত্যের মনোযোগী পাঠকদের পক্ষে চিত্তাকর্ষক অনুশীলন। অধ্যাপক শ্রীমান অলোক রায় এম. এ. এই আস্বাদন-কর্মে যোগ দিয়েছেন দেখে আমার প্রাক্তন ছাত্র হিসেবে তাঁর সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত নৈকট্য পুনরায় অনুভব করলুম। কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচীর জীবনকথা তিনি বহু পরিশ্রমে রচনা করেছেন।

যতীন্দ্রমোহনের সমসাময়িক সহযোগী কবিদের মধ্যে কেউ কেউ এখনো জীবিত আছেন। তাঁর জন্ম হয় ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৭এ নভেম্বর; মৃত্যু ১লা ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৮। এই সত্তর বছরের আয়ুষ্কালের তথ্য সঞ্চয় অধ্যবসায়ের কাজ। অধ্যাপক রায়কে সেজন্যে নানা জায়গায় যেতে হয়েছে, নানা বই পড়তে হয়েছে, এবং নিজের সমবেদনাবোধ, কাব্যরুচি ও সতর্ক বিবেচনার সাহায্যে প্রাপ্ত তথ্যাবলী তাঁকে প্রয়োজন-মতন সাজিয়ে নিতে হয়েছে।

নদীয়া জেলার মেহেরপুর-সন্নিহিত যমশেরপুর গ্রাম যতীন্দ্র-মোহনের জন্মস্থান। তাঁর পিতামহ রামগঙ্গা বাগচী নসীরপুররাজের দেওয়ান ছিলেন। যমশেরপুরে তাঁর প্রথম শিক্ষালাভ, তারপর বহরমপুরে খ্রীষ্টান মিশনারী স্কুলেও কিছুদিন কাটিয়ে বাল্যকালেই কলকাতায় আসেন যতীন্দ্রমোহন। ১৮৯৮এ হেয়ার স্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজে প্রবেশ করেন এবং সেই ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দেই,—মাত্র কুড়ি বছর বয়সে তাঁর বিবাহ হয়। ১৯০০তে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে এফ্. এ. পরীক্ষায় এবং ১৯০২এ তিনি ডাফ কলেজ থেকে বি এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

যতীন্দ্রমোহনের কর্মজীবনেও বৈচিত্র্য ছিল। কিছুদিন বিচারপতি সারদাচরণ মিত্রের প্রাইভেট সেক্রেটারী হিসেবে, আবার কলকাতা কর্পোরেশনে কিছুদিন,—কিছুদিন নাটোরের জগদিন্দ্রনাথের কাছে—এইভাবে তিনি নানা কাজে নিযুক্ত ছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সাহিত্য চর্চাও চলেছে। ১৩১৩ সালে, খ্রীষ্টাব্দের হিসেবে ১৯০৬এ তাঁর প্রথম কবিতার বই 'লেখা' ছাপা হয়।

অধ্যাপক রায় যতীন্দ্রমোহনের এই জীবন-বৃত্তান্ত লিখতে লিখতে জানিয়ে দিয়েছেন যে, সমকালীন করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় বা কুমুদরঞ্জন মল্লিকের মতন যতীন্দ্রমোহনের পল্লীগ্রামের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল না, তবে সম্পর্ক ছিল। বাংলার গ্রাম-জীবনের অন্তরঙ্গ ছবি আঁকবার হাতও তাঁর ছিল, আবার কলকাতার জীবনও তিনি তাঁর কবিতায় কিছু কিছু প্রকাশ করে গেছেন।

'মানসী' এবং 'যমুনা' পত্রিকার সম্পাদনায় যতীন্দ্রমোহনকে অংশ নিতে হয়। তাঁর 'নাগকেশর', 'বন্ধুর দান', 'জাগরণী' ইত্যাদি কবিতার বইগুলি যখন ছাপা হয়, সেই সময়ে, অর্থাৎ আমাদের শতকের দ্বিতীয়-তৃতীয় দশকের সন্ধিকালে তাঁর কবিখ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। 'ভারতী' পত্রিকার ঐ সময়ের বিখ্যাত কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের সঙ্গে যতীন্দ্র-মোহনের খুবই স্নেহ-প্রীতির সম্পর্ক ছিল। রবীন্দ্রনাথের কাছে

যতীন্দ্রমোহনই সত্যেন্দ্রনাথকে নিয়ে যান। রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র এবং সেকালের শীর্ষস্থানীয় স্মরণীয় লেখকরা যতীন্দ্রমোহনের গুণগ্রাহী ছিলেন।

অধ্যাপক রায় তাঁর এই আলোচনা প্রধানত 'কবি' ও 'কাব্য'— এই দুটি বিভাগে ভাগ করে নিয়েছেন। প্রথম বিভাগে যতীন্দ্র-মোহনের কবি-জীবনের কথাসূত্রে অনিবার্যভাবে জড়িত কবিত্বেরও কোনো কোনো প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়েছে। 'গ্রন্থ-পরিচয়' অংশ এই বিভাগেরই অন্তর্ভুক্ত। তাতে প্রকাশের তারিখ, প্রকাশকের উল্লেখ, কবিতার তালিকা ইত্যাদি দেওয়া হয়েছে। 'পল্লীকথা' নামে সংক্ষিপ্ত এক গদ্যরচনার উল্লেখ আছে এ অংশে। এই বই ছাপা হয়েছিল কি না, সে বিষয়ে লেখক নিশ্চিতভাবে কিছুই জানতে পারেননি,— লিখেছেন, 'গ্রন্থটির বিজ্ঞাপন দেখেছি। গ্রন্থটি আমরা এ যাবৎ দেখবার সৌভাগ্য লাভ করিনি।' এই উল্লেখ ছাড়া যতীন্দ্রমোহনের গদ্য-রচনার মধ্যে তাঁর উপন্যাস 'পথের সাথী' এবং তাঁর সুপরিচিত প্রবন্ধের বই 'রবীন্দ্রনাথ ও যুগসাহিত্য' বইখানিরও উল্লেখ দেখা গেল। যতীন্দ্রমোহনের সমকালীন রবীন্দ্র-যুগের নবীন কবিদের গোষ্ঠীভেদের কথা আছে এই 'কবি' অংশে। সেই সূত্রে 'ভারতী'র লেখকগোষ্ঠীর প্রসঙ্গে বলা হয়েছে—'ভারতী পত্রিকার (এবং পরবর্তী-কালে কল্লোল-কালিকলম-প্রগতি) সম্পাদকদ্বয় নিজের প্রতিভা দিয়ে লেখকদের আকর্ষণ করেননি, এবং সাহিত্যিক হিসাবে সত্য বলতে কি তাঁদের কৃতিত্ব খুবই কম।' এই উক্তিটি অল্প পরিসরে শেষ হয়েছে বলে আকস্মিক মনে হতে পারে। কিন্তু এরকম মন্তব্য পাঠককে বিশ্লেষণ ও পুনর্বিচারের উৎসাহ দেয়। সেদিক থেকে এসব তাড়নার দাম আছে বলে মনে করি। 'ভারতী'-গোষ্ঠীর কবিদের কয়েকটি সাধারণ লক্ষণের তালিকা দিতে গিয়ে একটি লক্ষণ এই দেখানো হয়েছে যে তাঁরা 'শিল্পের জন্য শিল্প মতবাদের সমর্থন' জানিয়েছেন। এটিও ভাববার কথা; এখানেও বিতর্কের সুযোগ

আছে। অধ্যাপক রায়ের এই বইখানি এইসব কারণে আমার কাছে খুবই সমাদরযোগ্য মনে হয়েছে। তাঁর সব মতামত সকলের সঙ্গে মেলে না বলেই তাঁর চিন্তার পৃথক একটি ধারা চোখে পড়ে। সেই পৃথক ধারাটি যুক্তিতর্কহীন অবিন্যস্ত ব্যাপার নয়। পদে পদে তিনি সাহসের পরিচয় দিয়েছেন, অথচ হঠকারিতার ভাব দেখান নি। তিনি এই 'ভারতী'-গোষ্ঠীর কবিপ্রকৃতির দ্রুত বিশ্লেষণের সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিকতার কথা তুলেছেন এবং কুমুদরঞ্জন প্রভৃতি কবিদের ভক্তিভাবের উল্লেখ করে এই মন্তব্য প্রকাশ করেছেন যে,--"'ভারতী'-গোষ্ঠীর কবিদের মধ্যে নাগরিক মনের প্রকাশ একান্ত প্রধান।"

মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, হেমেন্দ্রকুমার রায়, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, কিরণধন চট্টোপাধ্যায়, যতীন্দ্রমোহন বাগচী—প্রধানত এই ক'জনকে এই 'ভারতী'-গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত দেখিয়ে লেখক সত্যেন্দ্রনাথকে এঁদের মধ্যমণি বলেছেন এবং এই কথা সোজাসুজি জানিয়েছেন যে, এই গোষ্ঠীর অনেকেই একান্তভাবে শুধু সত্যেন্দ্রনাথের-ই অনুকরণ করে গেছেন—এবং 'তার ফল অত্যন্ত শোচনীয় হয়েছে।' এই প্রসঙ্গেই তাঁর আরো একটি মন্তব্য এই ভূমিকায় স্মরণযোগ্য ; তিনি লিখেছেন —"এঁদের কবিতায় আশ্চর্য একটা সজীবতা আছে যা হয়তো 'বলাকা' পর্বে রবীন্দ্রনাথকেও কিছুটা প্রভাবিত করেছিল।" আবার, সে-যুগে রবীন্দ্রনাথের অনুকরণ করেছিলেন যাঁরা (বলা বাহুল্য প্রায় সকলেই তো), তাঁদের লেখা থেকে নিতান্তই উদাহরণ হিসেবে তিনি কয়েকটি কবিতার কয়েক ছত্র তাঁর এই আলোচনায় স্মরণ করেছেন।

'রবীন্দ্র-প্রভাব ও স্বকীয়তা' অধ্যায়টিতে যতীন্দ্রমোহনের নিজের লেখা থেকেও আরো কিছু দৃষ্টান্ত ব্যবহার করে তিনি জানিয়েছেন—'যতীন্দ্রমোহন রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে শুধু কবিতার ভাষা-ছন্দ-স্তবকবন্ধটুকুই গ্রহণ করেন নি, প্রায় সময়েই ভাববস্তুতেও তিনি রবীন্দ্রনাথের কাছে ঋণী।' তাহলেও যতীন্দ্রমোহনের স্বকীয়তা

ছিল। এই স্বকীয়তার দিকগুলিও একে একে দেখানো হয়েছে।

এই পর্যন্ত এ-বইয়ের 'কবি' বিভাগের বিস্তার। এরপর 'কাব্য' বিভাগে পল্লী-কবিতা, প্রকৃতির কবিতা, রোমান্টিক কবিপ্রকৃতি ইত্যাদি প্রয়োগ যতীন্দ্রমোহনের কাব্য-কবিতা সম্পর্কে কতদূর সংগত সে বিষয়ে সংক্ষিপ্ত একটি অধ্যায় যোজনার পরে যতীন্দ্রমোহনের কাব্য সম্পর্কে আরো নানা কথা আছে। যতীন্দ্রমোহন যে একজন 'আধুনিক' কবি এবং আধুনিকতা যে সংশয়ে, যন্ত্রণায় এবং অন্যান্য লক্ষণে আশ্রিত,—এ আলোচনায় সে-প্রসঙ্গও দেখা দিয়েছে।

বাংলা কবিতার অনুরাগী সাধারণ পাঠকদের কাছে এবং ছাত্র-সমাজে অধ্যাপক রায়ের এ আলোচনা সমাদৃত হবে বলে আশা করি। তাঁর সম্বন্ধে আরো আশা করি যে, এ আলোচনার দ্বিতীয় সংস্করণে তিনি এ সংস্করণের কয়েকটি মন্তব্য আরো একটু বিশদভাবে আলোচনা করবেন। কিন্তু সে ভবিষ্যতের কথা। ইতিমধ্যে যে কাজ তিনি শেষ করেছেন, সেই কাজটুকুই অভিনন্দিত হোক্।

হরপ্রসাদ মিত্র

কল্যাণীয় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন বাগ্‌চী

আমরা তো আজ পুরাতনের কোঠায়,
নবীন বটে ছিলাম কোনো কালে—
বসন্তে আজ কত নূতন বোঁটায়
ধরল কুঁড়ি বাণী বনের ডালে॥
কত ফুলের যৌবন যায় চুকে
এক বেলাকার মৌমাছিদের প্রেমে।
মধুর পালা রেণুকণার মুখে
ঝরা পাতায় ক্ষণিকে যায় থেমে।
ফাগুন-ফুলে ভরেছিল সাজি
শ্রাবণ মাসে আনো ফলের ভিড়।
সেতারেতে ইমন্‌ উঠে বাজি
সুর-বাহারে দিক কানাড়ার মীড়॥

২রা ভাদ্র ১৩৩৮

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[যতদূর জানি এই কবিতাটি এ পর্যন্ত রবীন্দ্র-রচনাবলীর অন্তর্ভুক্ত হয় নি—গ্রন্থকার]



জন্ম : ২৭শে নভেম্বর, ১৮৭৮ মৃত্যু : ১লা ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৮

কবি

ভারতবর্ষে জীবনী রচনার প্রথা সুপ্রাচীন নয়। বিশেষতঃ কবি-জীবনী কদাচিৎ লিপিবদ্ধ হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, তার জন্য তিনি দুঃখিত নন; কারণ তথ্যের মালাগাঁথা ঘটনাপরম্পরা কবিকে বুঝতে কিছুমাত্র সাহায্য করে না। য়োরোপে এ সম্বন্ধে ভিন্ন ধারণা বর্তমান; কবি যেহেতু স্বয়ম্ভু নন, কাজেই যে বিশেষ দেশ-কালের পক্ষ-পুটে কবি লালিত তার পরিচয় না নিলে কবি-পরিচয় অসম্পূর্ণ থাকবে; আর বিশেষ কবির মনোজগতের পরিচয় নিতে গেলে তাঁর জীবনের ঘটনাবলীও তাই জানা দরকার, এবং তার জন্য প্রয়োজন তথ্যনিষ্ঠ কবি-জীবনী। অবশ্য যিনি নিজেকে অতিক্রম করতে পারেন, যদি তা আদৌ সম্ভব হয়, তবে তাঁকে আর ধরা-ছোঁওয়া যায় না; এবং সে অবস্থায় তাঁর জীবনী রচনাও তাৎপর্যহীন। যতীন্দ্রমোহন বাগ্‌চীর জীবনী লিপিবদ্ধ করার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি; তিনি নিজেকে বা নিজের কালকে অতিক্রম করতে পারেননি, সে চেষ্টাও তিনি করেন নি। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য, কবি যতীন্দ্রমোহন যদিও অতি অল্পকাল হলো মরজগৎ ছেড়ে গেছেন, তবু তাঁর জীবনী রচনার মতো তথ্য ইতোমধ্যেই দুষ্প্রাপ্য হয়ে উঠেছে। সম্ভবতঃ এ ব্যাপারে আমাদের চিরাগত বাস্তব-ঔদাসীন্যই জীবন ও মৃত্যুর মধ্যে দ্রুত এই অনধিগম্য দূরত্ব সৃষ্টি করেছে। তবু প্রথম-প্রয়াস হিসাবে আমরা আমাদের সাধ্যানুযায়ী তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা করলুম; এরই সাহায্যে হয়তো ভবিষ্যতে পূর্ণতর কবি-জীবনী রচনা সম্ভব হবে।

যতীন্দ্রমোহনের জন্ম নদীয়া জেলার মেহেরপুর মহকুমার অন্তর্গত যমশেরপুর গ্রামে। যমশেরপুর বাগ্‌চী পরিবার একদা বাংলাদেশের প্রধান জমিদারদের মধ্যে অন্যতম বলে বিবেচিত হতেন। যতীন্দ্র-মোহনের পিতামহ রামগঙ্গা বাগ্‌চী ছিলেন নসীরপুররাজের দেওয়ান।

যতীন্দ্রমোহনের পিতার নাম হরিমোহন বাগ্‌চী, মাতার নাম গিরিশ-মোহিনী দেবী। যতীন্দ্রমোহনের জন্ম হয় ১২ই অগ্রহায়ণ ১২৫৮ সালে (২৭ নভেম্বর ১৮৭৮)। যতীন্দ্রমোহনের বাল্যকাল গ্রামেই কেটেছে। তিনি যমশেরপুর ছাত্রবৃত্তি স্কুলে প্রাথমিক শিক্ষালাভ করেন। মুর্শিদাবাদেও বাগ্‌চীদের অনেক জমিজমা ছিল, এবং বহরমপুরে তাঁদের একটি কাছারি ছিল। বাল্যে যতীন্দ্রমোহন অনেকদিন বহরমপুরে কাটিয়েছেন এবং সেখানকার মিশনারী স্কুলে পড়াশুনা করেছেন। ঠিক কোন্ বছর তিনি কলকাতায় আসেন, তা জানা যাচ্ছে না; তবে ১৮৯৮ খ্রীস্টাব্দে তিনি হেয়ার স্কুল থেকে এণ্ট্রান্স পাশ করেন। সম্ভবতঃ তেরো-চোদ্দ বছর বয়স পর্যন্ত তাঁর গ্রামেই কাটে,[১] এবং বেশ একটু বেশী বয়সে তিনি এণ্ট্রান্স পাশ করেন। এই সময়েই ১৮৯৮ খ্রীস্টাব্দে ভাবিনীদেবীর সঙ্গে যতীন্দ্রমোহনের বিবাহ হয়। তখন তাঁর বয়স কুড়ি বছর। এর দুবছর পরে ১৯০০ খ্রীস্টাব্দে তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে এফ-এ পাশ করেন। কলকাতায় এই সময় থেকেই তাঁর স্থায়ীভাবে বসবাস; যদিও বিভিন্ন উৎসব অনুষ্ঠান উপলক্ষে এবং ছুটির সময় তিনি গ্রামে যেতেন এবং গ্রামের সঙ্গে যোগাযোগ তিনি আজীবন রক্ষা করেছেন। ১৯০২ খ্রীস্টাব্দে ডাফ কলেজ থেকে যতীন্দ্রমোহন বি-এ পাশ করেন।

যদিও একদা জমিদারী ছিল, কিন্তু বিংশ শতাব্দীর প্রথম থেকেই সামাজিক এবং অর্থনৈতিক কারণে জমিদারীর আয় কমতে থাকে, ফলে যতীন্দ্রমোহনকেও অর্থোপার্জনের কথা ভাবতে হয়। যতীন্দ্র-মোহনের কর্ম জীবনে বৈচিত্র্য আছে; স্বভাবতই গতানুগতিকতায় তিনি পীড়িত হতেন, এবং কর্মপরিবর্তন তাঁর পক্ষে অনিবার্য ছিল। তাঁর কর্ম জীবন সুরু হয় বিচারপতি সারদাচরণ মিত্রের প্রাইভেট সেক্রেটারী রূপে। সারদাচরণ আইনজ্ঞ হিসাবে খ্যাতিমান ছিলেন, কিন্তু তাঁর সাহিত্যানুরাগও তাঁকে কলকাতার বিদগ্ধ সমাজে প্রতিষ্ঠা দান করেছিল। সারদাচরণের সাহচর্য যতীন্দ্রমোহনকে

প্রথম যৌবনেই সাহিত্যিক মহলে পরিচিত হতে সাহায্য করে। "সারদাচরণ মিত্রের অর্থানুকূল্যে এই সময় সাহিত্যরথী স্বর্গীয় নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় তাঁর বহুজন প্রশংসিত 'বিদ্যাপতি-পদাবলী' সংকলন করেন। সারদাচরণের প্রতিনিধি রূপে কবি (যতীন্দ্রমোহন) এই দুরূহকার্য সম্পাদনে গুপ্ত মহাশয়কে নানাভাবে সাহায্য করেন। বস্তুতঃ তাঁর উদ্যম ও পরিশ্রম ব্যতীত এই সংকলন প্রকাশ করা হয়ত সম্ভব হত না।"[২]

এরপর যতীন্দ্রমোহন কিছুদিন কলিকাতা কর্পোরেশনের লাইসেন্স ইন্‌সপেক্টরের কাজ করেন; বলাবাহুল্য কাজটি কবি-জনোচিত নয়, অবস্থাচক্রের দাসখৎ মাত্র। এই সময়েই তাঁর সঙ্গে নাটোরের মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ রায়ের পরিচয় হয়, এবং পরে যতীন্দ্রমোহন জগদিন্দ্রনাথের প্রাইভেট সেক্রেটারী নিযুক্ত হন। জগদিন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর যতীন্দ্রমোহনকে আবার কর্ম পরিবর্তন করতে হয়; এবার এফ. এন. গুপ্ত পেন কোম্পানীর ম্যানেজারী। এতেও মন বসলো না, তখন স্বাধীন ব্যবসা-চিন্তা, কোলিয়ারী কারবার ইত্যাদি।

এরই সঙ্গে সঙ্গে চলেছে সাহিত্যচর্চা, কবিতা রচনা। যতীন্দ্র-মোহন বি-এ পড়ার সময় থেকেই কবিতা লিখছেন; রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে এই সময়েই তাঁর পরিচয় হয়। ১৩১৩ সালে (১৯০৬ খ্রীস্টাব্দে) যতীন্দ্রমোহনের প্রথম কাব্য সংকলন 'লেখা' প্রকাশিত হলো। যতীন্দ্রমোহন তাঁর স্মৃতি কথায় লিখেছেন "আমার কাব্য 'লেখা' গ্রন্থখানি আমার অনুরোধে কবি আদ্যন্ত অতি সযত্নে দেখিয়া দিয়াছিলেন। কাটিয়া ছাঁটিয়া মাঝে মাঝে দু চার ছত্র নিজে হইতে যোগ করিয়া দিয়াও তিনি যে ভাবে আমাকে উৎসাহিত করিয়াছিলেন, সে কথা আমার ইহজীবনে ভুলিবার নহে। ঐ গ্রন্থ তাঁহারই চরণে উৎসর্গ করিয়া আমি ধন্য হইয়াছি।"[৩]

১৩১৫ সালে ফাল্গুন মাসে 'মানসী' পত্রিকা প্রকাশিত হলো। কার্যাধ্যক্ষ ছিলেন সুবোধচন্দ্র দত্ত; কার্যালয় ২।৫ চৌরঙ্গী,

কলকাতা। প্রথমদিকে 'ইহার সম্পাদনভার কোন একজন বিশিষ্ট সম্পাদকের উপর নির্ভর করা হয় নাই। ইহা মাননীয় সভ্যগণের অনুমত্যানুসারে চারিজন বিশিষ্ট সভ্যের উপর ন্যস্ত করা হইয়াছে।' যতীন্দ্রমোহন প্রথম থেকেই 'মানসী' পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এক বৎসরে 'মানসী' কি করেছে, দ্বিতীয়বর্ষের সূচনায় ব্যোমকেশ মুস্তাফী তার বিস্তারিত পরিচয় দিয়েছেন; "বর্তমান-সাহিত্যযুগ-বিধাতা রবীন্দ্রনাথ সূতিকাগারেই ইহার 'ললাট-লিপি' লিখিয়া ইহার ভাগ্য-পথ নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন, আর তাঁহারই লিখিত ভূমিকা-মন্ত্রে ইহার জাতকর্ম সুসম্পন্ন হইয়াছিল।......মানসীর প্রথম কার্য—নবীন-প্রবীণে মিলাইয়া মিশাইয়া সাহিত্যানুরাগীদিগের তৃপ্তি বিধান করা—যতটা সাধ্যে কুলাইয়াছে, মানসী তাহা করিয়াছে।...মানসীর অধিকাংশ লেখক নবীন,—তাহাদের অভিজ্ঞতা অল্প, ক্ষমতাও অল্প,—তাই মানসীতে গল্প ও কবিতার আদরই বেশী হইয়াছে।"[৪] তৃতীয় বর্ষ থেকে ফকিরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও সুবোধচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে যতীন্দ্রমোহনের নাম পত্রিকা-সম্পাদক রূপে মুদ্রিত হতে দেখি। 'মানসী' প্রথম থেকেই রবীন্দ্র-সমর্থকদের মুখপত্র। বিশেষ করে প্রথম তিন-চার বছর 'মানসী' পত্রিকার প্রত্যেক সংখ্যাতেই দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ও সুরেশচন্দ্র সমাজপতিকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করা হয়েছে। সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের ব্যঙ্গ কবিতাগুলিও (বইঠি বিকায়: 'অয়ি তরলিকা! অয়ি মধুলিকা! হে দেবী সুরেশ্বরী'[৫]) এই সময় 'মানসী'তে প্রকাশিত হয়। 'সাহিত্য' পত্রিকায় (জ্যৈষ্ঠ ১৩১৬) দ্বিজেন্দ্রলাল 'কাব্যেনীতি' নামে যে প্রবন্ধ লেখেন, যতীন্দ্রমোহন ঐ নামেই একটি প্রবন্ধ লিখে 'মানসী'তে (ভাদ্র ১৩১৬) তার জবাব দেন। কালিদাস রায় লিখেছেন: 'কবি যতীন্দ্রমোহন দ্বিজেন্দ্রলালের এই অবিচার ও অনাচার (রবীন্দ্র-সমালোচনা) সহ্য করিতে পারিলেন না। তিনি দ্বিজেন্দ্রলালের বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করিয়া তাঁহার প্রত্যেকটি ক্রুর মন্তব্য ও অযথা দোষারোপের উত্তর দেন।

কবি-বন্ধু সত্যেন্দ্রনাথকেও তিনি তাঁহার সহকারী পাইয়াছিলেন।.... ইহার ফলে যতীন্দ্রমোহনের সঙ্গে দ্বিজেন্দ্রলালের বান্ধবতার বন্ধন চিরদিনের জন্য ছিন্ন হইয়া যায়। এই উপলক্ষে কেবল অকৃত্রিম রবীন্দ্রভক্তি নয়—কবির বলিষ্ঠ চিত্তেরও আমরা পরিচয় পাইয়াছি।'[৬]

অবশ্য এই মানসী পত্রিকাতেই[৭] দ্বিজেন্দ্রলালের মৃত্যুর পর যতীন্দ্রমোহনের রচিত শোক-গাথা প্রকাশিত হয়েছে :

'শতাব্দীর দুঃখ দৈন্যে জর্জরিত যাহার হৃদয়,
হাস্য যে অমৃত তার—অবসন্ন আত্মার অভয়।
তুমি সেই অমৃতের কবি ঋষি, মহাপ্রচারক
দেশভক্ত মহাকর্মী, জননীর অক্লান্ত সাধক ;'......

এবং বৃদ্ধ বয়সে যতীন্দ্রমোহন তাঁর স্মৃতি কথায় লিখেছেন : 'হাস্য-রসিক কবি ও নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায় মহাশয়ের সহিত আমার পরিচয় হইয়া ক্রমে তাহা অন্তরঙ্গতায় পরিণত হইয়াছিল। দ্বিজু-বাবু অতি অমায়িক, নিরহঙ্কার ও উদার প্রকৃতির লোক ছিলেন। পরে, অন্যের প্রভাবে ও প্ররোচনায় তাঁহার সহিত আমাদের সদ্ভাবের যে অন্যথা হইয়াছিল, এবং যে কারণে হৃদ্য সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইয়াছিল, তাহা আর লিখিব না।'[৮]

'মানসী' পত্রিকার ৬ষ্ঠ বর্ষ তৃতীয় সংখ্যা (বৈশাখ ১৩২০) থেকে নাটোরের মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ রায় (১৮৬৮-১৯২৬) সম্পাদনা ভার গ্রহণ করেন। জগদিন্দ্রনাথ নিজে সুকবি ও সুলেখক ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ[৯] ও প্রমথ চৌধুরীর সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব ছিল। সাহিত্যানুরাগী মহারাজার উদ্যোগে 'মানসী' পত্রিকা এই সময় থেকেই বিশেষ সমৃদ্ধি ও প্রতিষ্ঠা লাভ করে। বলাবাহুল্য জগদিন্দ্রনাথের নাম পত্রিকা-সম্পাদকরূপে মুদ্রিত হলেও, পত্রিকার লেখা সংগ্রহ, সংশোধন ও ও প্রচার কার্যে যতীন্দ্রমোহন পূর্বের মতই পরেও সকল দায়িত্বভার পালন করেছেন।

'মানসী' পত্রিকা সাতবৎসর নিয়মিত প্রকাশিত হওয়ার পর, ফাল্গুন ১৩২২ থেকে সাপ্তাহিক 'মর্মবাণী'র সঙ্গে সংযুক্ত হয় এবং মহারাজা জগদিন্দ্রনাথের সম্পাদনায় 'মানসী ও মর্মবাণী' নামে মাসিক পত্রিকা রূপে প্রকাশিত হতে থাকে। যতীন্দ্রমোহন এই পর্যায়েও পত্রিকা সম্পাদনার সঙ্গে বিশেষভাবে যুক্ত ছিলেন এবং পত্রিকায় নিয়মিত কবিতা এবং কখনো কখনো গল্প ও প্রবন্ধ লিখেছেন।

মহারাজ জগদিন্দ্রনাথের সঙ্গে পরিচয় যতীন্দ্রমোহনের কর্মজীবনে ও সাহিত্যজীবনে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। যতীন্দ্রমোহনের সঙ্গে জগদিন্দ্রনাথেব 'বান্ধবতা'র সূচনা আনুমানিক ১৯০২ খ্রীস্টাব্দে। যতীন্দ্রমোহন বিশেষ একটি দিনের কথা লিখেছেন: "কবির (রবীন্দ্রনাথ) পত্নীবিয়োগের দিন (৭ অগ্রহায়ণ ১৩০৯) ঘটনাচক্রে আমি তাঁহার গৃহে উপস্থিত ছিলাম। ...ঐ সময় নাটোরের মহারাজা জগদিন্দ্রনাথও ঐ স্থানে উপস্থিত ছিলেন। তৎপূর্বে তাঁহার সহিত আমার পরিচয় ছিল না। গৃহের নিভৃত একটি একতলার কক্ষে, কতকটা ভদ্রতা ও বাধ্যতাবশতই পরস্পরের আলাপসূত্রে সেদিন পরিচয় এবং ঐ পরিচয়ই উত্তর কালে বান্ধবতায় পরিণত হইয়াছিল,—অবশ্য যদি ধনী-দরিদ্রের মধ্যে মিলন একেবারেই অসম্ভব নয় বলিয়া স্বীকৃত হয়। 'বান্ধবতা এমন জিনিস রসের। তফাৎ কিছুই রাখে না সে ধনের মনের, বিদ্যার বা বয়সের।' ॥"[১০]

কৈশোর থেকেই যতীন্দ্রমোহন রবীন্দ্র-ব্যক্তিত্ব ও রবীন্দ্র-কবি প্রতিভার চুম্বকে স্বতঃ-আকৃষ্ট। 'রবীন্দ্রনাথ ও যুগসাহিত্য' গ্রন্থে যতীন্দ্রমোহন তার বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকেও রবীন্দ্রনাথ বাঙালী পাঠক সমাজের কাছে পূর্ণ মর্যাদা লাভ করেন নি। বরং সে যুগের সাহিত্যরথীরা রবীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রানুরাগী কবিদের সাধারণতঃ ব্যঙ্গই করতেন।

সেই প্রবল রবীন্দ্রবিরোধিতার যুগে যে তরুণ ভক্তের দল সর্বপ্রথম প্রকাশ্য জনসভায় রবীন্দ্রনাথের পঞ্চাশৎ জন্মদিবস উপলক্ষে এক

সম্বর্ধনার আয়োজন করেন, তাঁদের মধ্যে প্রধান ছিলেন যতীন্দ্রমোহন, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগ্‌চী, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়। ২৮ জানুয়ারী ১৯১২ খ্রীস্টাব্দে কলকাতার টাউন হলে এই উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। মনে রাখতে হবে, রবীন্দ্রনাথ তখনও নোবেল প্রাইজ পাননি। "পরিষদের সভাপতি সারদাচরণ মিত্র মহাশয় সভার কার্য আরম্ভ করিয়া বলিলেন, 'কবিকে সম্মান করিয়া আমরা আপনাদিগকে সম্মান করিতেছি।' ...সঙ্গীতাচার্য শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে কবি যতীন্দ্রমোহন বাগ্‌চী রচিত সময়োচিত গান গীত হইল।"[১১] যতীন্দ্রমোহন রচিত সঙ্গীতটি এখানে উদ্ধৃত করি:

'বাণী বরতনয় আজি স্বাগত সভামাঝে।
অযুত চিত-কমলে যেথা আসন তব রাজে॥
কাব্য-গীত-চিত্র-গাথা— সপ্তস্বরা তারে
মুখর করি নিখিল লোক হরষ-পারাবারে,
বিশ্ববীণা-যন্ত্রে তব বিজয়বাণী বাজে॥
আষাঢ় মেঘমন্দ্র কাঁপে গভীর তব ছন্দে,
সরস শোভা পরশে রসি' চরণ তব বন্দে,
মধুর স্বরে মাধবী-সখা কোয়েলা মরে লাজে॥
ঘনায়ে আসে গহন মেঘ অতুল তুলি স্পর্শে,
সুখের আলো উজলি' জলে গভীরতর হর্ষে—
শান্তি দিয়া সান্ত্বনায়, শক্তি দিয়া কাজে॥
বঙ্গভাষা ডাকিছে তোমা শত সেবক-কণ্ঠে,
বঙ্গ আজি মিলিত—তব মিলন-সুধা বণ্টে;
বাজায়ে শুভ-শঙ্খ আজি ডাকিছে নিজে মা যে!
এস হৃদয় বন্ধু, এস— এসে হে কবিসূর্য,
মায়ের ঘরে বাজিছে তব অভিবাদন তূর্য—
স্বাগত কবিরাজ-অধিরাজ বরসাজে!'

'অভ্যর্থনা-সঙ্গীত রূপে গায়কের কোরাসে গানটি গীত হইল। তৎপরে রামেন্দ্রসুন্দর-লিখিত একখানি অতি সুরচিত মানপত্র পাঠান্তে কারুকার্যমণ্ডিত একটি বিচিত্র রৌপ্যাধারের আবরণে

কবিকে প্রদত্ত হইল এবং হস্তিদন্তের পুঁথিতে খুদিয়া সত্যেন্দ্রের একটি রচনা ও লেখকের (যতীন্দ্রমোহন) কবিপ্রশস্তি নামে একটি কবিতা ornamented অক্ষরে লিখিয়া ও ফ্রেমে বাধাইয়া কবিকে উপহৃত হইল। ···আমাদের প্রদত্ত এই শ্রদ্ধার অর্ঘ্য কবি যে প্রসন্নতার সহিত গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার প্রত্যক্ষ পরিচয় পাইতে বিলম্ব ঘটে নাই। কয়েকদিনের মধ্যে কবির নিকট হইতে তাঁহার জোড়াসাঁকোর গৃহে এই সপ্তভক্তের (যতীন্দ্রমোহন, করুণানিধান, প্রভাতকুমার, মণিলাল, দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগচী ও চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়) নিমন্ত্রণ-সৌভাগ্য মিলিয়া গেল।'[১২]

রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত যতীন্দ্রমোহনের সঙ্গে কবির ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। যতীন্দ্রমোহন একাধিকবার শান্তিনিকেতনে গিয়ে থেকেছেন, রবীন্দ্রনাথও বহুবার যতীন্দ্রমোহনের গৃহে এসেছেন। রবীন্দ্র-শিষ্য-কবিগোষ্ঠীর মধ্যে যতীন্দ্রমোহন রবীন্দ্রনাথের অন্তরঙ্গতম ছিলেন। যতীন্দ্র-কবিমানসে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব তাই কেবলমাত্র যুগ গত নয়, ব্যক্তিগতও বটে।

যতীন্দ্রমোহনকে রবীন্দ্রনাথ দীর্ঘদিন যাবৎ যে সকল পত্র লিখেছেন, সেগুলি একত্রিত করে প্রকাশ করার প্রয়োজন আছে। স্থানাভাববশতঃ আমরা সবগুলি মুদ্রিত করতে পারলুম না, এখানে কয়েকটি মাত্র মুদ্রিত হলো।

১.

ওঁ

কল্যাণীয়েষু,

আমাকে এখন কোনো কর্তব্যের তাড়না দিয়ো না। দিলেও কোনো ফল পাবে না। আমি এখন কিছুকাল নিষ্কৃতি অবলম্বন করে থাকতে চাই। উটের পক্ষে শেষ খড় বলে একটা পদার্থ আছে—আমার বোঝা তার এত কাছে এসে পৌঁচেছে

যে এখন কুটো দেখলে আমার বিভীষিকা হয়। আপাতত মৌনব্রত নিয়েচি—এখন দীর্ঘকাল আমার কোনো সাড়া পাবে না—

ইতি ৯ কার্তিক ১৩২৪।

শুভাকাঙ্খী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২.

ওঁ

কল্যাণীয়েষু,

আমি তোমার উপর কিছুমাত্র রাগ করি নাই। শরীর মন এবার এত ক্লান্ত যে সামান্য কোনো কাজের প্রসঙ্গ হইলেই সেই পাড়া হইতে সে সরিয়া পড়িতে চায়। আসল কথা মনকে অনেকদিন বাহিরে বাহিরে টো টো করিয়া ফিরিতে হইযাছে, এবার সে আপনার মধ্যে স্থিব হইয়া বসিয়া স্তব্ধতার মধ্যে হইতে রস আকর্ষণ করিয়া তৃষ্ণা মিটাইতে চায়। এমন অবস্থায় সংসারের সমস্ত দাবীকে সম্পূর্ণ ঠেলিয়া বাখিতে ইচ্ছা হয়। সেইজন্য ছোটবড় সমস্ত কর্তব্যের ভিড় সমস্ত দায়িত্বের বেড়া হইতে বাহির হইয়া পড়িবার জন্য এবার একটু বিশেষ আগ্রহ কবিয়াছিলাম। ঘটিয়া উঠিল না, তাই আবার তুফানে তরী ভাসাইলাম।

ইতিমধ্যে তোমার নাগকেশর পড়িয়া দেখিলাম। দেখিলাম তোমার লেখনী তোমার কবিত্বকে পক্ষিরাজ ঘোড়ার মতন এখনো সমান বেগে বহিয়া লইয়া চলিয়াছে; এখনো তাহার ক্লান্তির লক্ষণ নাই, বরঞ্চ নিজের গতিবেগে সে যেন আরো মাতিয়া উঠিয়াছে। তোমার নিপুণ ছন্দের পায়ে পায়ে অনায়াস নৃত্যলীলার নূপুর বাজিতেছে, আবার তাহার হাতে ও মাথায় কানায়-কানায়-ভরা বিচিত্র রসের থালি। বোধ হয় এককালে ইন্দ্রসভার রঙ্গভূমিতে তাহার স্থান ছিল, কোন একটা পদস্খলনের অভিশাপে মর্তে আসিয়া পড়িয়াছে, কিন্তু নন্দনের লীলা ভোলে নাই, এবং অমরাবতীর প্রতি

এখনো তার দাবী আছে। কিন্তু অমরাবতীর কোন্ মহলের প্রতি তোমার কবিত্বের পক্ষপাত বোঝা গেল না—মনে হইল সকল দিকেই তাহার লোভ—কি শিবের কৈলাসে, কি বিষ্ণুর বৈকুণ্ঠে, কি সেই অলকাপুরীতে যেখানে বিরহিণীর দীর্ঘ নিঃশ্বাসে শিশিরার্দ্র শরতের করুণের শিউলিগুলি রাত না পোহাতেই ঝরিয়া ঝরিয়া পড়িতেছে।

ইতি ১৭ই কার্তিক ১৩২৪।

শুভাকাঙ্খী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩.

ওঁ

কল্যাণীয়েষু,

শরীর অসুস্থ হয়েছিল, এখনো ক্লান্ত আছে, তাই কাজে মন দিতে পারচি নে অথচ বাধ্য হয়ে কাজ করতে হচ্চে। তাতে কাজও হচ্চে না, বিশ্রামও হচ্চে না। আমার এই অবস্থা—হেনকালে তোমরা আমাকে কিছু অনুরোধ করলে আমি ভীত হই—আমার ভার আর বাড়িয়ো না। পূর্ব কর্মফল যা স্কন্ধের উপর বসেচে তার দায় বহন করাই দুঃসাধ্য, এর উপরে নূতন দায়িত্বের যোগ কোরো না।

শারদোৎসবের রিহার্সাল এখানে ধীরে ধীরে চলচে। এইখানে তার প্রথম অভিনয় হবে। তার পরে যখন সাহস পাব তখন কলকাতার আসরে নামবার চেষ্টা করব। ইতি ৯ আশ্বিন ১৩২৮।

শুভাকাঙ্খী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ভবিষ্যতে যখনি কলকাতায় কোনো গানের সভার আয়োজন করতে হবে নিশ্চয়ই তোমার মেয়েটিকে ডাক পড়বে। ওর কণ্ঠ ভাল, রীতিমত গান শিক্ষা দেওয়া কর্তব্য।

৪.

ওঁ

কল্যাণীয়েষু,

তোমার নীহারিকা পড়ে খুসি হয়েছি। কিন্তু অভিমত দেবার পালা আমি সাঙ্গ করতে চাই। তার একটা দায়িত্ব আছে। সে দায়িত্ব কবির নয়। তোমারও যে পথ আমারো সেই পথ, এ পথে চলাই ভালো, কিছু বলা ভাল নয়—ভুল বলারও আশঙ্কা আছে অপ্রিয় বলারও—সেটাও নেহাৎ কর্তব্যের খাতিরে স্বীকার করা যেতে পারে কিন্তু গায়ে পড়ে করতে গেলে বিড়ম্বনা ঘটে—আর কিছু না হোক প্রচুর সময় নষ্ট হয়, শান্তি নষ্ট হবারো সম্ভাবনা আছে।

তোমার লেখনী পরিণত, তোমাকে কি পাঠক সমাজের কাছে নতুন করে পরিচিত করিয়ে দেবার দরকার আছে? সাহিত্যে তুমি আপন স্থানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছ, তবে আমি কেন বৃথা আমার কর্ম বাড়িয়ে তুলি।

তোমার কাব্যগ্রন্থের নাম দিয়েছ নীহারিকা। কেন দিয়েছ? ঝাপ্‌সা কিছুতো দেখচিনে—তোমার সুর-বাঁধা বীণা পাকা হাতেই বাজচ্চ, রাগিনী স্পষ্ট হয়েই ফুটে উঠবে— ভাষাও যেমন তেমন নয়, ছন্দেরও তাল কাটে না, রসেরও দীনতা বা অনিশ্চয়তা নেই, —এর মধ্যে কুয়াশাটা কোনখানে তাতো দেখতে পাচ্ছি নে। তোমার কাব্য নিজের সুনিশ্চিত পরিচয়। নিজের মধ্যে বহন করেই পাঠক সমাজে দাঁড়িয়েচে—যার চেনবার দৃষ্টি আছে সে চিনে নেবে।

এই পর্যন্ত লিখে হঠাৎ আবিষ্কার করলুম তোমার চিঠি, সেই সঙ্গে ঠিকানা, হারিয়েছে। বিধাতার পরম দয়ায় এরকম ঘটনা আমার প্রতিদিনই ঘটে, তাতে আমার নৈষ্কর্ম্য সাধনার অনেক সহায়তা করে। এই কাজে বিধাতার দূতটি কে ঠিক জানিনে, হয়তো বা দক্ষিণ পবন—তিনি নিজে কবির বন্ধু বলেই কবি-বন্ধুদের প্রতি

অপ্রসন্ন, তাই বনের জীর্ণপাতার প্রতি তাঁর যেমন ব্যবহার আমার টেবিলের চিঠিগুলির প্রতিও তেমন। ইতি ১৭ চৈত্র ১৩৩৪।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

তোমার কাব্যের প্রতি কোনো সমালোচক অবজ্ঞা প্রকাশ করেচে কিনা আমি জানিনে—ছাপার কাগজের মুখোষ পরে যারা বিচারক সাজে, মুখোষ খুলিয়ে তাদের কণ্ঠধ্বনি শুনলেই তখনি বোঝা যায় তারা কোন্ জাতের। সৃষ্টি করবার অধিকার তোমার লেখনীতে আছে। যে-কোনো ছাপার কাগজওয়ালার বক্রদৃষ্টিতে কি তাকে ক্ষুণ্ণ করতে পারে? যে বাক্য তোমাকে খর্ব করতে চায় তোমার বাণীর পরমায়ু তার চেয়ে বেশি।

এ চিঠি ডাকে দেবার জন্য তোমার দ্বিতীয় তাগিদের অপেক্ষায় ছিলুম, এমন সময় দেখি কাগজপত্রের স্তূপের মধ্যে তোমার চিঠি হারাধন রক্ষিত হয়ে বিরাজ করচে।

৫.

ওঁ

কল্যাণীয়েষু,

তুমি বোধহয় কাগজে দেখে থাকবে, আমি সর্বসাধারণের দরবারে ছুটির দরখাস্ত করেছি। কাজকর্মে মন দেওয়া এখন অসাধ্য, শরীরটাও এই নৈষ্কর্ম্যে প্রশ্রয় দিয়ে থাকে। নিতান্ত দায়ে পড়ে মাঝে মাঝে আমার সংকল্পের ব্যত্যয় হয় বলেই বিপদে পড়ি। কবিতা বা গল্প হঠাৎ লিখে ফেলতে পারতুম লেখনীর এমন ঐশ্বর্যের দিন একদা ছিল, এখন লেখনীকে লগিরূপে ব্যবহার করলে কাজ যে চলে না তা নয়, কিন্তু যাকে চালাতে হয় সে ঘোর আপত্তি করে। বোঝাই গাড়ির গোরুটার দুঃখ যথেষ্ট, কিন্তু যে গাড়োয়ানটাকে অবিশ্রাম হ্যাক্ হ্যাক্ করতে এবং গুঁতো চালাতে হয় তার অবস্থাটা ঈর্ষার যোগ্য নয়। আমার সত্যযুগ চলে গেছে তবু মান্ধাতার মতো টিঁকেই আছি এটা গৌড়ীয় প্রচলিত রীতি নয়। সেজন্য দেশের

লোকের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি—বেঁচে থাকার অপরাধটাকে দুঃসহ করে তুললে অপরাধের দ্রুত প্রতিকার হবে সন্দেহ নেই, কারণ যম দয়াময় দেবতা। ইতি ৭ অগস্ট ১৯৩৩। তোমাদের

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৬.

ওঁ

কল্যাণীয়েষু,

একটা অত্যন্ত জরুরি লেখা নিয়ে পড়েছিলুম। সেটা সখের লেখা নয়, তার মেয়াদ ছিল সঙ্কীর্ণ, অথচ শরীর ছিল ক্লান্ত, মন ছিল ক্ষীণশক্তি—এমন সময় বরাহনগর বাসকালে কেউ এসে আমাকে খবর দিলে তুমি দেখা করতে চেয়েচ। তার পূর্বেই পত্রযোগে শিশু-বার্ষিকীব জন্য আবেদন পাঠিযেছ—আমার ঝুলি তখন নিঃস্ব। সহজেই মনে হলো এই ক্লান্তি ও ব্যস্ততার সময়ে তুমি আমাকে দুঃসাধ্য সাধন করতে অনুরোধ কববে। 'হাঁ' বলতে সময় লাগে না এবং মনেও ক্ষোভ থাকে না, কিন্তু 'না' বলতে সময় অনেক বেশি লাগে, কাজটাও হয় অপ্রিয়। তাই টেলিফোন বার্তাবহকে জানাতে বল্‌লুম যে যদি বার্ষিকীর জন্যে অনুরোধ তোমার উদ্দেশ্য হয় তবে এখানে আসা বৃথা হবে। এর মধ্যে একটু সদ্বিবেচনাও ছিল—তুমি বাস করো যেখানে, সেখান থেকে প্রাক্-মোটর যুগে বরাহনগর আসতে হোলে ঘরে কান্নাকাটি উঠত—অত্যন্ত অপ্রিয় একটা 'না' শব্দ শোনাবার জন্যে এতখানি পেট্রোলের অপব্যয় ঘটতে দেওয়া ফৌজদারি আদালতে মামলার যোগ্য। উচিত ছিল স্বয়ং স্বকণ্ঠে এ-সম্বন্ধে তোমার সঙ্গে বোঝাপড়া করা—এই রকম অনবধানতাযোগে অনেক অনর্থ ঘটে—এক্ষেত্রেও তাই ঘটেচে। এখন গতস্য শোচনা ছাড়া আর কোনো গতি নেই। মনে রেখো বয়স হয়েচে, এখন মেজাজটা সম্পূর্ণ বাণপ্রস্থী গোছের, সামান্য দায়িত্বও গুরুভার হয়ে উঠেছে এর ফলে অসৌজন্য অনিবার্য। আমি অপরাধ না করলেও

আমার দেশবাসীরা আমাকে ক্ষমা করেন না—আজকাল দুর্বল দেহ মনে অপরাধ জমিয়ে তুলচে—আমার টেবিলটা যদি দেখে যাও বুঝবে বোঝাটা কত ভারি! তাই ক্ষমার ভরসা সম্পূর্ণ ত্যাগ করেই বিশ্রামের সাধনায় নিযুক্ত থাকতে হয়েচে। তোমার বয়স যখন পঁচাত্তরের কাছে পৌছবে তখন আমার কথা স্মরণ করে নিশ্চিত তোমার মনে করুণার উদ্রেক হবে। সেইদিনের জন্যে অপেক্ষা করে রইলুম। ইতি ১৭ শ্রাবণ ১৩৪৩। তোমাদের

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৭.

ওঁ

কল্যাণীয়েষু,

কবিত্বের আসরে যাদের নতুন আগমন তাদেরিতো পরিচয় দরকার। তুমি চেনা বামুন, তোমাকে ফিরে ফিরে পৈতা পরাবার মানে নেই।

তাছাড়া আমি তোমাদের করুণা প্রার্থনা করি। অভিমত দেওয়ার বিপত্তি থেকে আমাকে রক্ষা কোরো। সত্তর পেরোলে লেখা সম্বন্ধে অভিমত দিতে ভগবান মনু নিষেধ করেছেন—শ্লোকটা খুঁজে পাচ্ছিনে, বোধহয় বাণপ্রস্থ্যের বিধি সম্বন্ধেই সেটা গাঁথা আছে। একটা কথা মনে রেখো, নতুনের ভিড়ের মধ্যে পুরাতন মাঝে মাঝে অলক্ষ্য হয়ে আসে এটা অনিবার্য। সকল সময়ে রসের টানেই পাঠক আকৃষ্ট হয় যে তা নয়, নতুনত্বের কৌতূহলের মোহ নতুন যুগের মন ভোলায়— অনেকে দ্বিতীয় পক্ষের বিবাহ করে, শ্রেষ্ঠতার তুলনা করে নয়, যেমন করে হোক স্বাদ বদলাবার লোভে। সাহিত্যেও তাই। কিন্তু অধুনাতনদের উত্তেজনা স্থায়ী হয় না। চিরকালীনের দীপ্তি কুয়াশা কাটিয়ে আবার দেখা দেয়। এই কুয়াশাটাকে কোনো অভিমতের খোঁচা দিয়ে তাড়ানো যায় না; এর মেয়াদ ফুরোয়

আপনিই। যাই হোক তোমার রচনা স্রোতে ভেসে চলেছে, আমাকে দিয়ে লগি ঠেলাবার প্রস্তাব কোরো না। ইতি ১৯ শ্রাবণ ১৩৪৩।

তোমাদের

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৮.

ওঁ Gouripur Lodge
Kalimpong.

কল্যাণীয়েষু,

মন এখনো জেগে আছে কিন্তু তার বাহনগুলো অপটু। ক্লান্ত লেখনীতে আশীর্বাদ জানাই তোমার সাহিত্য-সাধনা সার্থকতার পথে এগিয়ে চলুক। ইতি ৩রা বৈশাখ ১৩৪৭।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ইতোমধ্যে যতীন্দ্রমোহনের 'রেখা' (১৩১৭) ও 'অপরাজিতা' (১৩২০) কাব্য প্রকাশিত হয়েছে। যতীন্দ্রমোহন তখন আরপুলি লেনে থাকেন। তিনি সঙ্গীতানুরাগী মজলিসী প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। তাঁর গৃহে নিত্য গানের আসর, নিয়মিত সাহিত্য বাসর। প্রবীণ এবং নবীন সকল সাহিত্যিকের সমাগম হতো তাঁর গৃহে। "সে সব দিনে—তখন সেটা ১৩১৮ সাল—বাগচি-কবির বৈঠকখানায় কলকাতার একটা সেরা সান্ধ্য মজলিস বসত। বহু গুণী-গায়ক ও সাহিত্যিক—সে মজলিসে জমায়েত হতেন। বাংলাদেশের সব জ্যোতির্ময় নক্ষত্র—গ্রহপতি স্বয়ং যতীন্দ্রমোহন। যতীন্দ্রমোহনের অতিথিবাৎসল্য নগর বিশ্রুত। কোথায় কোন ভাঙা দেয়ালের আড়ালে 'নূতনের কেতন উড়ছে', কোথায় কার মাঝে মৃদুতম সম্ভাবনা, ক্ষীণতম প্রতিশ্রুতি—সব সময়ে তাঁর চোখ-কান খোলা ছিল। আভাস একবার পেলেই উদ্বেল হৃদয়ে আহ্বান করে আনতেন। তাঁর বাড়ির দরজায় যে

হাসনাহেনার গুচ্ছ ছিল তার গন্ধ প্রীতিপূর্ণ হৃদয়ের গন্ধ।"[১৩]নজরুল ইসলামকে যতীন্দ্রমোহনই প্রবীণ সাহিত্য-সমাজে পরিচিত করিয়ে দেন, আর নজরুলকে যতীন্দ্রমোহনের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন নলিনীকান্ত সরকার। যতীন্দ্রমোহনের হৃদয়বত্তার আর এক প্রকাশ বন্ধু বাৎসল্যে। কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত যতীন্দ্রমোহন সম্বন্ধে লিখেছেন: "যতীন আমার বাল্যবন্ধু ছিল না, বয়সে আমার চেয়ে সাড়ে আট বৎসরের বড় ছিল। আমার কৃষ্ণনগরের বাসায় এসে আমার সঙ্গে প্রথম যেদিন দেখা করে তখন তার বয়স কিছু কম করে চল্লিশ হবে। যশ, অর্থ, প্রতিপত্তি যথেষ্ট। নাটোরের মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ রায়ের সঙ্গে একযোগে সেদিনের সুপ্রসিদ্ধ মাসিক পত্রিকা 'মানসী'র সম্পাদক। কলকাতায় আরপুলি লেনে তার বাড়ীতে তখন প্রায়ই সাহিত্যের মজ্‌লিস বসে। রবীন্দ্রনাথেব স্নেহে ও বাংলার কাব্য পাঠকগণের শ্রদ্ধায় তখন সে সুপ্রতিষ্ঠ। আর আমি ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডেব নগণ্য অধস্তন পথ পরিদর্শক। মানসীতে প্রেরিত 'শিবের গাজন' কবিতাটি পড়ে তার ভাল লেগেছিল। সেইজন্য কৃষ্ণনগরে কোন কাজে এসে সে আমার ভালবাসায় আমাব সঙ্গে পরিচয় করতে এল। তাব অনুরোধে আমি আমার পুঁজি থেকে কয়টি কবিতা তাকে সসঙ্কোচে পড়ে শোনালাম। কবিতা শোনবার পর সে আমায় 'মিতে' সম্বোধন করে একেবারে বুকে জড়িয়ে ধরল।......একজন সম্পূর্ণ অপরিচিত অখ্যাত কবি-প্রার্থীর কয়েকটি কবিতা ভাল লাগায় তাকে বুকে জড়িয়ে মিতা পাতাবার মত কোন খ্যাতনামা কবি আজকাল আছেন কিনা জানিনে। আর সেই মিতালি যে বিগত বত্রিশ বছরের নানা মত-ভেদ-বিতর্ক-ঈর্ষা-যশোলিপ্সা-কলুষিত সাহিত্যিক আবহাওয়ার মধ্যে কেমন করে রক্ষা করে গেল তা আমিও ঠিক জানিনে। আমাদের কবিতাগত, ভাবগত ও প্রকৃতিগত পার্থক্য ছিল প্রচুর। কিন্তু যতীন এমন কোন কৌশল আয়ত্ব করেছিল যাতে আমার

স্বভাব-বন্ধুরতাগুলো তার বান্ধবতাকে আঘাত করতে পারত না, বরং সে নিপুণভাবে মৈত্রী বন্ধনের অনুকূল করে নিত।”[১৪]

যতীন্দ্রমোহনের জীবনের বেশী অংশটাই কেটেছে কলকাতায়। ছাত্রজীবন, কর্মজীবন এবং সাহিত্যজীবন এই শহরকেই আশ্রয় করে গড়ে উঠেছে। এদিক থেকে কুমুদরঞ্জন মল্লিক বা করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত পল্লীগ্রামের সঙ্গে তাঁর যোগ ঘনিষ্ঠ নয়। তবে পল্লীগ্রামের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক কোনদিনই বিচ্ছিন্ন হয়নি ; প্রতি বছরই তিনি যমশেরপুরে যেতেন এবং গ্রামের মানুষদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করতেন। ফলে তাঁর কবিতায় গ্রাম-বাংলার যে অন্তরঙ্গ ছবি ফুঠে উঠেছে, তা অন্য নাগরিক কবিদের রচনায় পাওয়া যায় না। যতীন্দ্রমোহনের ‘রেখা’ কাব্য পড়ে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছিলেন : “এক-একটি ছোটো-খাটো রেখার টানে গ্রাম্য দৃশ্যগুলি কেমন ফুটিয়া উঠিয়াছে! তোমার কবিতায় ‘ফড়িং’ ও ‘প্রজাপতি’ও আদর পাইয়াছে। তোমার ছন্দবন্ধ সুমধুর; ভাষাও ভাবের উপযোগী। কোন কোন কবিতায় সুললিত সংস্কৃত শব্দের প্রাচুর্য, আবার গ্রাম্য-দৃশ্যের বর্ণনায় ভাবব্যঞ্জক চলিত গ্রাম্যশব্দের নিপুণ প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়।”

‘মানসী’ পত্রিকা প্রকাশের সময় থেকেই ‘যমুনা’ নামে আর একটি পত্রিকা প্রকাশিত হতে থাকে ; পত্রিকাটির সম্পাদক ছিলেন ফণীন্দ্রনাথ পাল। যতীন্দ্রমোহন ফণীন্দ্রনাথ ও ‘যমুনা’ প্রসঙ্গে লিখেছেন : ‘অমন স্বার্থলেশহীন দেবচরিত্র ও নিরহঙ্কার সরল আচরণ ঐ বয়সের আর যে কোন ব্যক্তির পক্ষে অসম্ভব বলিয়া মনে হয়। অল্পদিনেই তাঁহার সহিত আমার প্রগাঢ় বান্ধবতা হইয়াছিল এবং পরে ঐ যমুনারই বৈঠকে বাংলার অদ্বিতীয় কথাশিল্পী ও মহাপ্রতিভার অধিকারী শরৎচন্দ্রের সৌহার্দলাভ করিয়াছিলাম! এই ফণীবাবুর সহযোগিতায় পাঁচ বৎসর ‘যমুনা’র সম্পাদন কার্যও আমাকে করিতে হইয়াছিল।’[১৫] ১৩২৮ এবং ১৩২৯ সালের ‘যমুনা’য়

ফণীন্দ্রনাথ পালের সঙ্গে যতীন্দ্রমোহনের নাম সম্পাদকরূপে মুদ্রিত হতে দেখি।

এই সময়ে যতীন্দ্রমোহনের কবিখ্যাতি সর্বাধিক প্রচারিত হয়। তাঁর 'নাগকেশর' (১৯১৭) 'বন্ধুর দান' (১৯১৮) এবং 'জাগরণী' (১৯২২) প্রকাশিত হয়েছে। 'নাগকেশর' সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা আমরা আগেই দেখেছি। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত যাদবেশ্বর তর্করত্ন কবির কাব্য প্রতিভায় মুগ্ধ হয়ে পুণ্য বারাণসীধামে তাঁকে 'কবি কুলেশ্বর' উপাধিতে ভূষিত করেন।

এর পর যতীন্দ্রমোহন যথাক্রমে 'নীহারিকা' (১৯২৭) এবং 'মহাভারতী' (১৯৩৬) কাব্য প্রকাশ করেন। কিন্তু ততদিনে 'ভারতীযুগ' অবসিত হয়েছে। রবীন্দ্র-কাব্যে পর্বান্তরের মধ্য দিয়ে পাঠক রুচি পরিবর্তিত হতে সুরু করেছে। ইতোমধ্যে যতীন্দ্রমোহন তাঁর দুই কন্যা লীলা ও ইলাকে হারিয়েছেন। বিশেষতঃ মাত্র চোদ্দবছর বয়সে কন্যা ইলার মৃত্যু তাঁকে গভীরভাবে আঘাত করেছিল। ১৩৪৪ সালে চৈত্রমাসে হরিদ্বারে পত্নীর অকস্মাৎ মৃত্যু। শরীর ভেঙে গেছে; রোগভোগ; মানসিক ক্লান্তি; উপর্যুপরি শোকের আঘাত।

অবশ্য এই সময়েও যতীন্দ্রমোহন পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন; ১৩৫৩ সালের মাঘমাসে তিনি 'পূর্বাচল' পত্রিকা প্রকাশ করলেন, এবং মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি তার সম্পাদক ছিলেন। পুত্র মণীন্দ্রমোহন ছিলেন পত্রিকার প্রধান উদ্যোক্তা।

কালিদাস রায় লিখেছেন: 'বৃদ্ধবয়সে একদিকে ব্যাধির নিত্য-যন্ত্রণা, তাহার উপর ছিল তাঁহার দেশবাসীর প্রতি দারুণ অভিমান ও ক্ষোভ। একদিন দেশের অধিবাসীরা তাঁহাকে যথেষ্ট মর্যাদা দান করিয়াছিল—পরে তাহারা তাঁহার যথাযোগ্য মর্যাদা দানে বিরত হইল—ইহাই তাঁহার অভিমানের কারণ। এখানে কবির ভুল হইয়াছিল—তিনি তো তাঁহার গুরুর গানভঙ্গের বরজলালের কথা পড়িয়াছিলেন—তবু কেন ভুল হইল? কবি যাহাদের কাছে মর্যাদা

পাইয়াছিলেন এবং যাঁহাদের কাছে পরে মর্যাদা পাইলেন না—তাহারা অভিন্ন নয়। যাহারা মর্যাদা দিয়াছিল তাহারা পিতা—আর যাহারা দিল না তাহারা তাহাদের সন্তান। অতএব পিতা মর্যাদা দিল—তাহার পুত্র মর্যাদা দিল না বলিয়া ক্ষোভ অভিমান করা ভুল। মর্যাদাহানির প্রকৃষ্ট প্রমাণ তিনি পাইয়াছিলেন—বহুদিন হইতে তাঁহার একখানি ছাড়া কোন কাব্যগ্রন্থ মুদ্রিত অবস্থায় নাই। তাঁহার অজস্র কবিতা মাসিক পত্রের চত্বর হইতে গ্রন্থের মন্দিরে আরোহণ করে নাই—তাঁহার কবিতার একখানি চয়নিকা পুস্তকও নাই। কিছুকাল আগে তাঁহার একখানি চয়নিকা গ্রন্থ শুক্লাদ্বিতীয়া চন্দ্রের মত উদিত হইয়াই অস্তমিত হইয়াছে—প্রকাশকের আকস্মিক পতনে। তারপর বহু বৎসর অতীত হইল কোন প্রকাশক ঐরূপ একখানি গ্রন্থ প্রকাশে আগ্রহ প্রকাশ করে নাই।'[১৬]

কিন্তু বাঙালী কবি-সমাজে যতীন্দ্রমোহন যে স্বীকৃতি পেয়েছেন, তাও তুচ্ছ নয়। তাঁর পঞ্চাশবছর জন্মদিনে 'রসচক্র' থেকে তাঁকে অভিনন্দিত কবা হয় (৬ই ভাদ্র ১৩৩৮)। শরৎচন্দ্র ছিলেন তার প্রধান উদ্যোক্তা, তিনি বলেছিলেনঃ 'যতীনকে আমি সত্যি ভালোবাসি। শুধু কেবল কবি বলে নয়, তাঁর ভেতরে এমনি একটি স্নেহ-সরস, বন্ধুবৎসল ভদ্র মন আছে যে, তার স্পর্শে নিজের মনটাও তৃপ্তিতে ভরে আসে। যতীন জানেন, আমি তাঁর কবিতার একান্ত অনুরাগী। যখন যেখানেই তাদের দেখা পাই, বারবার করে পড়ি। স্নিগ্ধ সকরুণ নির্ভুল ছন্দগুলি কানে কানে কত কি বলতে থাকে। কারও সম্বন্ধেই নিজের মতামত আমি সহজে প্রকাশ করি নে,—আমার সঙ্কোচ বোধ হয়। ভাবি, আমার মতামতের মূল্যই বা কি, কিন্তু যদি কখনো বলতেই হয় তো সত্য কথাই বলি। যতীনকে স্নেহ করি, কিন্তু স্নেহের অতিশয়োক্তি দিয়ে তাঁকেও খুশি করতে পারতাম না, সত্যি না হলে।' সংবর্দ্ধনা সভায় সভাপতিত্ব করেন জলধর সেন।

যতীন্দ্রমোহনের ৬৬-তম জন্মদিনে আর একবার তাঁকে সংবর্দ্ধিত করা হয়। এবার উদ্যোক্তা ছিলেন কাশিমবাজারের মহারাজা, নাটোরের মহারাজা, শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি। সংবর্দ্ধনা-সমিতির সভাপতি ছিলেন ডঃ কালিদাস নাগ। ৩রা ডিসেম্বর ১৯৪৪, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ হলে অভিনন্দন-সভার আয়োজন করা হলো। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করলেন অতুলচন্দ্র গুপ্ত। বাংলাদেশের প্রবীণ ও নবীন কবিরা যতীন্দ্র-প্রশস্তি পাঠ করলেন। যতীন্দ্রমোহন প্রতিভাষণে শেষ কথা বললেন; 'আজ আমার কেবলই মনে হচ্ছে, সরস্বতীর প্রসাদে আপনাদের এই সমাদরের যোগ্যতা সত্যই যদি আমার থাকতো ; সত্যই যদি ভাল লিখতে পারতাম। কালের কষ্টিপাথরে যদি সত্যকার সোনার দাগ রেখে যেতে পারতাম! কিন্তু মনের মধ্যে বুঝছি, সময় যে আমার শেষ হয়ে এসেছে। নানা যোগ্যতর হস্তে, বিশেষ করে প্রতিভান্বিত নবীন কবিদের যোগ্যতর লেখনীতে আমার এই কামনা, এই আদর্শ সম্পূর্ণ হয়ে উঠবে। এই আশা নিয়ে আনন্দ ও অশ্রুভারাক্রান্ত দুই নেত্রে আপনাদের কাছে আজ আমি বিদায় গ্রহণ করছি। কবিগুরুর শেষ দুটি কথাই আমার বলতে ইচ্ছে করছে--

পেয়েছি ছুটি বিদায় দেহ ভাই,
সবারে আমি প্রণাম করে যাই।'[১৭]

১৯৪৮ সালে ৩০-এ জানুয়ারী মহাত্মাজীর মৃত্যু হলো। যতীন্দ্র-মোহন তার দুদিন পরে (১ ফেব্রুয়ারী ১৯৪৮) দেহত্যাগ করলেন।

১। 'আমি তখন হেয়ার স্কুলের ছাত্র, যখন বিদ্যাসাগর মহাশয় স্বর্গগত হইলেন।' (রবীন্দ্রনাথ ও যুগসাহিত্য : যতীন্দ্রমোহন বাগচী। ১৩৫৪। পৃঃ ৩-৪)। বিদ্যাসাগরের স্বর্গারোহণ—২৯ জুলাই ১৮৯১।

২। নরেন্দ্র দেব : 'কবি যতীন্দ্রমোহনের জীবন কথা'। (পূর্বাচল। ফাল্গুন ১৩৫৪)

৩। রবীন্দ্রনাথ ও যুগসাহিত্য। পৃঃ ২৫।

৪। মানসী। ফাল্গুন ১৩১৬।

৫। ঐ চৈত্র ১৩১৬।

৬। রবীন্দ্রনাথ ও যুগসাহিত্য। (পরিচায়িকা, পৃঃ ।/০)

৭। মানসী। শ্রাবণ ১৩২০।

৮। র-যু-সা। পৃঃ ৩৫।

৯। রবীন্দ্রনাথ ও জগদিন্দ্রনাথ—'উভয়ের জমিদারি ছিল সংলগ্ন, সৌহার্দ অবশ্য সেই জন্য হয় নাই, সৌহার্দ হয় জগদিন্দ্রনাথের সাহিত্য রস-গ্রাহিতার জন্য। সঙ্গীত শাস্ত্রেও তাহার বিশেষ জ্ঞান থাকায় উভয়ের মধ্যে এই বন্ধন সুদৃঢ় হয়। কবি এই মিত্রতার নিদর্শন স্বরূপ মহারাজকে 'পঞ্চভূত' উৎসর্গ করেন (১৩০৪ বৈশাখ)।' —প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ঃ রবীন্দ্র-জীবনী (প্রথমখণ্ড) (১৩৬৭) পৃঃ ৪১৪।

১০। র-যু সা। পৃঃ ২২-২৩।

১১। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ঃ রবীন্দ্র-জীবনী (দ্বিতীয় খণ্ড) (১৯৬১) পৃঃ ২৯৪।

১২। ব-যু-সা। পৃঃ ৪৪-৪৫।

১৩। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তঃ কল্লোল যুগ (১৩৬৬) পৃঃ ২৭।

১৪। যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তঃ 'মিতার স্মরণে'। (পূর্বাচল। ফাল্গুন ১৩৫৪)

১৫। র-যু-সা পৃঃ ৩৬।

১৬। কালিদাস রায়ঃ 'যতীন্দ্রমোহন'। (পূর্বাচল। ফাল্গুন ১৩৫৪)

১৭। 'স্বনামধন্য কবি যতীন্দ্রমোহন বাগ্‌চী মহাশয়ের ৬৬তম জন্মদিনে দেশবাসীর পক্ষ হইতে অভিনন্দন'—পুস্তিকা। (সংবর্দ্ধনা সমিতির পক্ষ হইতে শ্রীঅখিল নিয়োগী কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত) (১৩৫১) পৃঃ ১৪।

—*—

গ্রন্থ পরিচয়

কাব্য

১। লেখা (১৩১৩ বঙ্গাব্দ / ১৯০৬ খ্রীস্টাব্দ) কলিকাতা: ৪৯ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট হইতে সমাজপতি ও বসু কর্তৃক প্রকাশিত। এক টাকা। [||/০] ১১৫ পৃঃ।

উৎসর্গ॥ 'কবিগুরু শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয় শ্রীচরণ-কমলেষু।' ভূমিকা॥ "'লেখা'র কবিতাগুলি লেখা ইতিপূর্বে, বঙ্গদর্শন, সাহিত্য, ভারতী ও প্রবাসী প্রভৃতি মাসিকে মুদ্রিত হইয়াছিল। সেইগুলি ও আরো অনেকগুলি নূতন কবিতা 'লেখা' নাম দিয়া একত্র প্রকাশিত করিলাম। পূজনীয় শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয় স্নেহগুণে 'লেখা'র কবিতাগুলি দেখিয়া দিয়াছেন। শ্রদ্ধাস্পদ সুহৃদ শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ও পূজনীয় শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুব মহাশয়েরা গানগুলিব সুর-সংযোগ করিয়া দিয়াছেন। তাঁহাদের এই অনুগ্রহের জন্য আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি।"

যমশেরপুর। বৈশাখ সংক্রান্তি ১৩১৩।

[সূচীপত্র: জোনাকি। আবাহন। হাফিজের স্বপ্ন। আশা। এপার-ওপার। প্রতীক্ষা। ক্ষমা। আত্মীয়তা। সৌন্দর্যের বাসা। মিনতি। স্রোতেব কুসুম। হতভাগ্য। কবি-অভিষেক। কবির গান। সন্দিগ্ধ। পরাণ-পাখী। পূর্ণিমা-রাতে। বিহঙ্গ ও ব্যাধ। কৃষাণীর গান। মানুষ কোথা পাই। বাতায়নতলে। সাকী ও সরাব। প্রেমের অন্ধতা। ধানকাটার গান। সেদিন যবে। স্বীকার। রূপতৃষ্ণা। তবু কত না মধুর। সাধ। অপূর্ব মিলন। গৃহিণীহীন শ্বশুরালয়ে। কালো আঁখি। সান্ত্বনা। স্বপ্ন। ধরণীর প্রেম। প্রেমের প্রবেশ। মিছে মরি পথ ভুলে। প্রণয়ে। মায়া। শুভযাত্রা। সন্দেহ নাই কারো। রমণী ভাগ্য। দিদিহারা। শরতের আবাহন। নাস্তিক। কলঙ্কিনী। তবু। স্মৃতি। অসময়ে। খাঁটি সত্য। শিশু রহস্য। জেলের মেয়ে। কে দুঃখী। মিলন-মঙ্গল। বর। লীলা। হোলী খেলা। প্রদীপ। ইটালী। খ্যাপা। ভুল। বিশ্বপ্রাণ। দোল। মরণ। শেষ-খেয়া। রথ।]

২। রেখা (১৩১৭ বঙ্গাব্দ / ১৯১০ খ্রীস্টাব্দ)

ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস, ২২ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। বারো আনা (৸০) ৯৬ পৃঃ।

উৎসর্গ॥ 'পূজনীয় শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগ্‌চী, দাদা মহাশয় শ্রীচরণকমলেষু।' ভূমিকা॥ 'রেখার কবিতাগুলি রচনা ইতিপূর্বেই ভারতী, প্রবাসী, মানসী, সুপ্রভাত প্রভৃতি মাসিক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল; বাকীগুলি নূতন।'

যমশেরপুর। মহালয়া ১৩১৭।

[সূচীপত্র: রেখা। গোধূলি। জ্যোৎস্নালক্ষ্মী। শ্রাবণে। খেয়া ডিঙি। জন্মভূমি। আগন্তুক। স্বপ্নদেশে। মিলন। প্রেম। চাষার মেয়ের গান। মাছধরা। সরমরীতি। কবি। মুক্তি। তুমি। সুখ। দুঃখে-সুখ। আকুলতা। কলঙ্ক। অনুশোচনা। প্রীতি ও স্মৃতি। সন্ধ্যায় মিলন। প্রভাতে বিদায়। অভিযোগ। আবেশ। অনুতাপ। সরোবরে সন্ধ্যা। ভুল। প্রণয়িনী-পরিণয়ে। চাহনি। সমুদ্র-ফেনার প্রতি। প্রহেলিকা। সাটের গান। আবাহন। শিশুর বাণিজ্য। বিগত প্রণয়ে। প্রাণে প্রেম। প্রেমে প্রাণ। ককণানন্দ। জননীর অভিসম্পাত। কবি রজনীকান্ত সেনের প্রতি। সুকবি রজনীকান্ত সেনের মৃত্যুতে। সুসময়। ভ্রান্তি। মিলন। শাপে-বর। ব্রাহ্ম মুহূর্তে। শেষ-কথা। খেলা।]

৩। অপরাজিতা (১৩২০ বঙ্গাব্দ/১৯১৩ খ্রীস্টাব্দ)

সুবোধচন্দ্র দত্ত, ৪ চৌরঙ্গী, মানসী অফিস, কলিকাতা। [৸০] ১০৮ পৃষ্ঠা।

উৎসর্গ॥ 'বন্ধুবর শ্রীযুক্ত বটুকৃষ্ণ ঘোষ, এম-এ, বার এট্‌-ল করকমলেষু'। ভূমিকা॥ 'অপরাজিতার কতকগুলি রচনা ইতিপূর্বে মানসী, প্রবাসী, ভারতী প্রভৃতি বঙ্গীয় মাসিকে প্রকাশিত হইয়াছিল; বাকী কবিতাগুলি নূতন।'

যমশেরপুর। ১লা আশ্বিন ১৩২০।

[সূচীপত্র: অপরাজিতা। আগমনী। কোজাগর লক্ষ্মী। বিধবা। জীবন ও মৃত্যু। বাসনা। মঞ্জুর। সন্তানক। মায়ের মন। ফাল্গুনে। কাঞ্চন। সন্ধ্যামণি। নববর্ষা। পূজা গৃহে। ময়না। বাতায়নের দীপ।

প্রেম ও মৃত্যু। ত্যক্ত গৃহ। রাজকুমারী। দান ও পরিমল। নিবেদন। অভিশাপ। জটাই। শুকনো পাহাড়ে ফুল। সান্ত্বনা। নিরুপায়। চকিত। পত্র পরিচয়। রবীন্দ্রনাথ। অভ্যর্থনা সঙ্গীত। ঘুমহারা। কালো। অভিমান। বরাত। মুরুব্বি। লক্ষ্মী ছেলে। কান্না। দ্বিজেন্দ্র বিয়োগে। বিরাগী। শেষ।]

৪। **নাগকেশর**। (১৩২৪ বঙ্গাব্দ/১৯১৭ খ্রীস্টাব্দ)

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়, ২০১ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা। এক টাকা [১৵০] ১৫৪ পৃঃ।

উৎসর্গ॥ 'যাঁহার স্নেহচ্ছায় বসিয়া এই গ্রন্থের অধিকাংশ কবিতা রচনা সম্ভব হইয়াছে, সেই অশেষ গুণের খনি, হৃদয়-ধনের ধনী— কবি-মহারাজ শ্রীযুক্ত জগদিন্দ্রনাথ রায় মহোদয়ের করকমলে এই গ্রন্থ উৎসর্গ করিলাম।'

মহালয়া, ২৯ আশ্বিন, ১৩২৪, ১০/১ আরপুলি লেন, কলিকাতা।

[সূচীপত্র : নাগকেশর। শিব-সপ্তক। বসন্ত সম্ভব। চিরাগত। নবাগত। অন্ধবধূ। কাঙাল। রথযাত্রা। বৃন্দাবনী। আগমনী। জন্মাষ্টমী। প্রেম ও পূজা। রাজা। স্মৃতি। উৎসবে। ফাল্গুন-স্মৃতি। প্রণাম। সন্ধান। অন্ধপ্রেম। অশ্বিনের ব্যথা। শেষ অর্ঘ্য। ভুল। কেয়াফুল। কৃত্তিবাস-প্রশস্তি। ছুটি। পদ্মাতীরে। বহ্নিশিখা। বাঁশীওয়ালা। প্রেমোন্মাদ। তাজ। মথুরার রাজা। দৃষ্টি। শ্মশানপারের সন্ন্যাসী। ভ্রষ্ট যাত্রা। আমি। কলঙ্ক ভঞ্জন। মিনতি। পত্রলেখা। সাধনা। সেবাহীন। রাধা। পাখী। বঙ্গবধূ। স্বপ্ন রাণী। ভাঙা ঘরে চাঁদের আলো। সিন্ধু উদ্দেশে। মাতৃ মূর্তি। ভাগ্য দেবী। রামায়ণস্মৃতি। বিদায়ে। বঞ্চিতের বিদায়। জেলের ছেলে। মধুমাসে। শত্রু। অভিমান। নিষ্কৃতিহীন।]

৫। **বন্ধুর দান** (আশ্বিন ১৩২৫ বঙ্গাব্দ / ১৯১৮ খ্রীস্টাব্দ)

কমলা বুক ডিপো, ১৯৯ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা। পাঁচশিকা। ১২২ পৃঃ।

উৎসর্গ॥ 'স্বর্গীয় পিতৃদেবের শ্রীচরণোদ্দেশে।'

[সূচীপত্র : বন্ধুর দান। নিমাই। গৌরী। ময়না। মেঘরাজ। রাখাল। বাঁশী-ওয়ালা। মঞ্জুর। রাখাল। জটাই। তীর্থসঙ্কট। সহযাত্রী। ভক্তির জয়।]

৬। জাগরণী। (১৩২৯ বঙ্গাব্দ, ১৯২২ খ্রীস্টাব্দ)

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০৩/১/১ কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা। এক টাকা [৵০] ১৩৩ পৃঃ।

উৎসর্গ ঃ 'স্বর্গীয় মাতৃদেবীর শ্রীচরণোদ্দেশে।' নিবেদন॥ 'এই কাব্যগ্রন্থের অনেকগুলি কবিতাই ইতিপূর্বে বিভিন্ন বঙ্গীয় মাসিকে মুদ্রিত হইয়াছিল; এক্ষণে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইল।'

মহালয়া, ৩রা আশ্বিন ১৩২৯। ১০/১ আরপুলি লেন, কলিকাতা।

[সূচীপত্র ঃ জাগরণী। বিজয় চণ্ডী। পাশার বাজি। বৈশাখ। গান্ধী মহারাজ। পাগল। চরকা সঙ্গীত। বালগঙ্গাধর তিলক। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন। নন্দীর অনুশাসন। ভারতবর্ষ। বিপন্না। কর্ম। অকর্ম। দেশের লোক। সত্যদাস। শরৎরাণী। গঙ্গাসাগর। আলোর মেলা। গোবিন্দদাস। দেবেন্দ্রনাথ সেন। আষাঢ়। শ্রাবণী। বিচিত্রা। আসল কথা। প্রেমের কথা। ভুল। অনাহুত। অপরূপ প্রেম। নাম। কলঙ্কিনী। দেয়ালী। ফুলের দণ্ড। স্বরূপ। মালোর মেয়ে রবির-প্রশস্তি। রবীন্দ্রনাথ (গান)। আগন্তুক। গান (৭টি)। কবিবন্ধু সত্যেন্দ্রনাথ। সত্যেন্দ্রনাথ। নিঝুম-রাণী।]

৭। নীহারিকা। (১৩৩৪ বঙ্গাব্দ/১৯২৭ খ্রীস্টাব্দ)

[৵০] ১৪৪ পৃঃ।

উৎসর্গ॥ 'কবিবন্ধু শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত প্রিয়বরেষু।'

[সূচীপত্র॥ নীহারিকা। বাণী বন্দনা। দেয়ালা। তপস্বিনী ভারত। হিমালয়। পাহাড়ীয়া বাঁশী। পাহাড়ীয়া প্রেম। পাহাড়ী ফুল। ঝরণা-ধারা। ঝরণা তলায়। যৌবন চাঞ্চল্য। একা। বিসর্জন। অন্ধকার। যুগ্মঅশ্রু। অনামিকা। কালো। গঙ্গাস্নান। দেশবন্ধু। যুগাবতার চিত্তরঞ্জন। কবি চিত্তরঞ্জন। বীর প্রয়াণ। জগদিন্দ্রতর্পণ। কাশীতে চন্দ্রগ্রহণ। আগমনী-বিদায়। জন্মাষ্টমী। নীলকণ্ঠ। খেলা। প্রান্তর-পথে। অ-ধরা। করবী। ভুঁই চাঁপা। নেবু ফুল। নববর্ষা। শ্রাবণে। শরতে। মাধবিকা। বাসন্তিকা। দোল।। দোল-যাত্রা। একি দোল। বিপরীত। অ-ভদ্র কাব্য। বন্যাসঙ্কট। ভিক্ষা (গান)। উদাসী। জয়যাত্রা (গান)।

ভুলের মালা (গান)। সন্ধ্যায় (গজল গান)। ফিঙে। শুভদৃষ্টি। নারী। বৌদিদি। দ্বিপ্রহরে। একটি উপমা। ডাক। নিবেদন। হৈমন্তী। ফাল্গুনে (গজল গান)। শরৎচন্দ্র। ব্যথার পূজা। দুঃখ বিবাদী। উচ্ছৃঙ্খল। আমিহারা। বিদায়ে।]

৮। **মহাভারতী।** (প্রথম সংস্করণ ১৩৪৩/১৯৩৬ খ্রীস্টাব্দ। দ্বিতীয় সংস্করণ ১৩৪৮ বঙ্গাব্দ)

প্রবর্তক পাবলিশিং হাউস,৬১ বহুবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা। দেড় টাকা ১১৭ পৃঃ।

উৎসর্গ॥ 'কবিভ্রাতা শ্রীমান্ কালিদাস রায় করকমলেষু।'

ইলাবাস, হিন্দুস্থান পার্ক, বালিগঞ্জ, কলিকাতা। বৈশাখ ১৩৪৩।

[সূচীপত্র: কর্ণ। দুর্যোধন। ভীম। শবরীর প্রতীক্ষা। অশোক। জয়-পরাজয়। বাসবদত্তা। কষ্টি পরীক্ষা। মহানন্দনমঠ। সমীরণ। প্রাচীনার প্রলাপ পড়ো বাড়ী। আষাঢে লেখা। প্রতিশোধ। ভক্তভোলা। মুক্তি পথ। দুঃখবাদী বন্ধুর প্রতি। ভাটিয়ালী। পঞ্চাশোর্দ্ধে। সন্ন্যাসী। অনাগত। তাজমহল। কৃষ্ণা *।]

(* 'আমারই অনুরোধক্রমে কবি-বন্ধু যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত এই কবিতাটি রচনা করিয়াছেন। এই কাব্যগ্রন্থে লিখিত ভারত কথার সুরের সহিত ইহার সুরও মিলিয়াছে। তাই, মহাভারতীয় 'কৃষ্ণা' কথাতেই মহাভারতীর শেষ করা গেল।'— লেখক।)

৯। **কাব্য-মালঞ্চ** (প্রথম সংস্করণ শ্রাবণ ১৩৪৩ বঙ্গাব্দ)

পপুলার এজেন্সী, ২৬ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা। সাড়ে তিন টাকা।

[১/০] ৩১২ পৃঃ।

উৎসর্গ॥ 'শ্রদ্ধেয় বন্ধু রাজশেখর বসু করকমলেষু।'

নিবেদন॥ 'যাহাদের একান্ত আগ্রহে এই সঞ্চয়ন প্রকাশিত হইল, মালঞ্চর সেই মালাকর কবি-বন্ধু শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, শ্রীকালিদাস রায় ও শ্রীনন্দগোপাল সেনগুপ্তকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন ভিন্ন আমার অন্য কোন বক্তব্য নাই।'

[পর্যায়-সূচী: প্রাণ ও গান। স্বপ্ন ও মায়া। পল্লী ও প্রকৃতি। ছায়া-ছবি। ফুল ও মুকুল। এপার-ওপার। প্রেম ও পূজা। দেশদেবতা। প্রীতি ও স্মৃতি। গল্প ও গাথা। কায়া ও ছায়া।]

*কাব্য মালঞ্চ (দ্বিতীয় সংস্করণ ; তারিখ নেই)
মিত্র ও ঘোষ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা। পাঁচ টাকা।
[।৵০] ২৮১ পৃঃ।

১০। পল্লীকথা—(ঐতিহাসিক যৎকিঞ্চিৎ) মূল্য ।০

[গ্রন্থটির বিজ্ঞাপন দেখেছি। গ্রন্থটি আমরা এযাবৎ দেখবার সৌভাগ্যলাভ করিনি।]

উপন্যাস ঃ

১। পথের সাথী।

[যতীন্দ্রমোহনের এই উপন্যাসটি একদা যথেষ্ট জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল ; কিন্তু আজ সর্বজনবিস্মৃত। বহু অনুসন্ধানেও আমরা গ্রন্থটি সংগ্রহ করতে পারিনি।]

প্রবন্ধ ঃ

১। রবীন্দ্রনাথ ও যুগ সাহিত্য (১৯৫৪)
বৃন্দাবন ধর এণ্ড সন্স লিঃ, ৫ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।
[।৶০] ১০৭ পৃঃ।

উৎসর্গ॥ 'সুরসিক কথাশিল্পী শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় প্রিয়বরেষু'।
নিবেদন॥ 'বহুদিন হইতে আমি অতিশয় অসুস্থ ও গৃহবদ্ধ হইয়া আছি। এ অবস্থায় উদ্যোগী হইয়া গ্রন্থ প্রকাশ করা আমার পক্ষে সাধ্য নয়। তথাপি যে ইহা সম্ভব হইল, সে কেবল আমার পরম শ্রদ্ধেয় বন্ধুবর শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয়ের সৌজন্যে ও সুব্যবস্থায়। এ জন্য তাঁহার নিকট আমি চিরকৃতজ্ঞ রহিলাম।'
ইলাবাস। বালিগঞ্জ।
জগদ্ধাত্রী পূজা ১৩৫৪।

পত্রিকা ঃ

১। **মানসী**। তৃতীয় বর্ষ প্রথম সংখ্যা থেকে ষষ্ঠ বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যা (ফাল্গুন ১৩১৭—চৈত্র ১৩২০)। সম্পাদক—ফকিরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সুবোধচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও যতীন্দ্রমোহন বাগ্‌চী।

২। **যমুনা**। একাদশ ও দ্বাদশ বর্ষ (১৩২৮—১৩২৯) সম্পাদক—যতীন্দ্রমোহন বাগ্‌চী ও ফণীন্দ্রনাথ পাল।

৪। **পূর্বাচল**। প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যা থেকে দ্বিতীয় বর্ষ প্রথম সংখ্যা (মাঘ ১৩৫৩—মাঘ ১৩৫৪) সম্পাদক—যতীন্দ্রমোহন বাগ্‌চী।

—*—

‘ভারতী’-যুগের কবি

১৮৭৭ খ্রীস্টাব্দে ‘ভারতী’ পত্রিকার জন্ম। দীর্ঘ ছেচল্লিশ বছর পত্রিকাটি চলেছিল, এবং সাতজন সম্পাদক বিভিন্ন সময়ে পত্রিকাটি সম্পাদনা করেছেন। ‘ভারতী’ পত্রিকার লেখকগোষ্ঠী পরিবর্তিত হয়েছে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে, ফলে লেখার ভাববস্তু এবং কলাবিধিতেও কোন স্থিরতা থাকা সম্ভব হয়নি। তবু মোটের উপর ‘ভারতী’ পত্রিকা জন্মাবধিই জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির ছায়াতপ লাভ করেছিল—বিভিন্ন সময়ে এর সম্পাদনা করেছেন যথাক্রমে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৭৭-১৮৮৩), স্বর্ণকুমারী দেবী (১৮৮৪-১৮৯৪), হিরণ্ময়ী দেবী ও সরলা দেবী (১৮৯৫-১৮৯৭), রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৯৮) সরলা দেবী (পুনরায় ঃ ১৮৯৯-১৯০৭), স্বর্ণকুমারী দেবী (পুনরায় ঃ ১৯০৭-১৯১৪) এবং সবশেষের বছরগুলিতে সম্পাদক ছিলেন মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় ও সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় (১৯১৫-১৯২৩) (তারপরে সরলাদেবী আবার পত্রিকাটি একবার চালাবার চেষ্টা করেন কিন্তু মাত্র কয়েকটি সংখ্যা প্রকাশের পর পত্রিকাটি গতায়ু হয়)।

বর্তমানে আমরা 'ভারতী'-গোষ্ঠী বা 'ভারতীর বৈঠক' বলতে সাধারণতঃ শেষোক্ত সম্পাদকদ্বয়ের পরিচালনায় 'ভারতী' পত্রিকার যে একটি বিশেষ লেখক গোষ্ঠী গড়ে উঠেছিল, তাঁদেরই কথা বুঝি। এই সময়ে 'ভারতী'তে যাঁরা কবিতা লিখতেন, তাঁদের 'ভারতী'-গোষ্ঠীর কবি বলার অন্যতম কারণ এই যে তাঁদের মধ্যে একটি মানসিক সাযুজ্য গড়ে উঠেছিল, এককথায় তাঁরা ছিলেন একান্ত ভাবেই রবি-রশ্মিজালে আবদ্ধ।[২] (১৩১৮ সালে রবীন্দ্রনাথকে সংবর্দ্ধনা দেওয়ার সময়ে 'ভারতী'র একটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয়। তাতে দেবেন্দ্রনাথ সেন 'কবিবর রবীন্দ্রনাথের প্রতি' এবং সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত 'বরণ' নামে দুটি কবিতা লেখেন। রবীন্দ্রানুগত্য এই বোধ হয় প্রথম 'ভারতী'তে স্পষ্ট ভাষায় লিপিবদ্ধ হলো।) এঁদের আগে যাঁরা কবিতা লিখতেন, যেমন অক্ষয়কুমার বড়াল, প্রমথনাথ রায়-চৌধুরী, রমণীমোহন ঘোষ প্রভৃতির লেখাতেও রবীন্দ্রনাথের প্রভাব দুর্লক্ষ্য ছিল না, কিন্তু সেই সঙ্গে ঊনবিংশ শতাব্দীর কাব্যধারা বিশেষ করে হেমচন্দ্র (রবীন্দ্রনাথের কৈশোর রচনাতেও তাঁর প্রভাব সুস্পষ্ট), নবীনচন্দ্র, বিহারীলাল এবং সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের প্রভাব আরও গভীর ছিল। অন্যদিকে 'ভারতী'-গোষ্ঠীর বর্তমান কবিরা শুধু রবীন্দ্রনাথের দ্বারা প্রভাবিতই হননি, তাঁরা রবীন্দ্রনাথকে অনুকরণ করতেন—রবীন্দ্রবিরোধিতা ছিল তাঁদের কাছে অসহ্য; কিন্তু সেইখানেই শেষ হয়ে যায়নি তাঁদের কাব্য প্রয়াস, রবীন্দ্রনাথকে স্বীকার করে নিয়ে তাঁদের কবিতায় কতকগুলি সমকালীন যুগ-বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে—সেখানেই তাঁদের সাধর্ম্য।

এইখানে অবশ্য একটু অসুবিধা আছে, 'ভারতী'-গোষ্ঠীর কবিদের নামের তালিকা প্রস্তুত করার ক্ষেত্রে। কারণ যাঁরা এই সময়ে 'ভারতী'তে লিখতেন, অন্য অনেক পত্রিকাতেও তাঁদের লেখা বেরোতো। এই প্রসঙ্গে 'মানসী' পত্রিকার নামও উল্লেখযোগ্য, কারণ 'ভারতী' পত্রিকার একটি বড়ো অংশ 'মানসী'র সঙ্গে যুক্ত

ছিল।[৩] এই সময় 'ভারতী' এবং 'মানসী'র পরিচালকেরা ছিলেন উৎসাহী তরুণ—কবিরাও অধিকাংশই বয়সের দিক দিয়ে প্রাক্ চল্লিশের কোঠায়। কিন্তু প্রবীণ কবিদেরও কারো কারো লেখা এই সময়ে 'ভারতী'তে প্রকাশিত হতো না এমন নয়। যেমন প্রসন্নময়ী দেবী (১৮৫৭-১৯৩১), দেবেন্দ্রনাথ সেন (১৮৫৫-১৯২০) স্বর্ণকুমারী দেবী (১৮৫৮-১৯৩২), বিজয়চন্দ্র মজুমদার (১৮৬১-১৯৪২) অনঙ্গমোহিনী দেবী (১৮৬৪-১৯১৮)। এঁরা বয়সে এবং মনে উভয়তই প্রাচীনপন্থী ছিলেন, কাজেই তরুণ 'ভাবতী'-গোষ্ঠীর কবি-তালিকা থেকে এঁদের নাম বাদ দিচ্ছি। অন্যদিকে 'ভারতী'র একেবাবে শেষের দিকে কয়েকজন অতিতরুণ 'কল্লোল' গোষ্ঠীর কবির রচনা এতে প্রকাশিত হয়েছে। যেমন অমিয় চক্রবর্তী (১৯০১ —), অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত ১৯০৩—), শিববাম চক্রবর্তী (১৯০৫—), ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (১৯০৫—)। এঁরাও 'ভারতী-গোষ্ঠী'র কবিদের থেকে একটি দূরত্ব অনুভব করতেন, তাই এঁদের নামও এই তালিকার অন্তর্ভুক্ত কবা হলো না।

১৯১৫ থেকে ১৯২৩ পর্যন্ত 'ভারতী' পত্রিকায় যাঁরা কবিতা লিখেছেন, এবং যাঁদের কবিতা বিশেষ ভাবে সেই যুগের দ্বারা লক্ষণাক্রান্ত বলে মনে হয়েছে, তাঁদের নামের একটা তালিকা পেশ করছি। সাহিত্যের ইতিহাসে এঁদের অনেকেরই নাম খুঁজে পাওয়া যাবে না। তাই ঐতিহাসিক কারণে এই তালিকাটি যথেষ্ট মূল্যবান বলে মনে করি।

হিরণ্ময়ী দেবী (১৮৭০-?) প্রিয়ম্বদা দেবী (১৮৭১-১৯৩৫), দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগচী (১৮৭৩-১৯২৭), হেমলতা দেবী (১৮৭৫—), করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৭৮-১৯০৫), যতীন্দ্রমোহন বাগচী (১৮৭৮-১৯৪৮), গিরিজাকুমার বসু (১৮৮২-১৯৪৫), সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত (১৮৮২-১৯২২), কুমুদরঞ্জন মল্লিক (১৮৮২—), অনুরূপা দেবী (১৮৮২-১৯৫৮), কিরণধন চট্টোপাধ্যায় (১৮৮৭-১৯৩১), মণিলাল

গঙ্গোপাধ্যায় (১৮৮৮-১৯২৯), মোহিতলাল মজুমদার (১৮৮৮-১৯৫১), হেমেন্দ্রকুমার রায় (১৮৮৮-১৯৬৩), কালিদাস রায় (১৮৮৯—), নরেন্দ্র দেব (১৮৮৯—),ইন্দিরা দেবী(১৮৮৯-১৯১৪), সুখরঞ্জন রায়(১৮৮৯—), যতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য (১৮৯০—), হেমেন্দ্রলাল রায় (১৮৯২-১৯৩৫), প্যারীমোহন সেনগুপ্ত (১৮৯৩-১৯৪৭), রাধাচরণ চক্রবর্তী (১৮৯৩-১৯৩৮), নিরুপমা দেবী (১৮৯৫—), সুধীরকুমার চৌধুরী (১৮৯৭—), ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত, মন্মথনাথ ঘোষ, প্রাণকৃষ্ণ অধিকারী, নলিনীনাথ দে, দেবেন্দ্রনাথ মহিন্তা, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, গোপেন্দ্রনাথ সরকার, সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরেশানন্দ ভট্টাচার্য, শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা, প্রফুল্লময়ী দেবী, যোগীন্দ্রনাথ রায়, বিমানবিহারী মুখোপাধ্যায়, রাধারাণী দত্ত, সুশীলাসুন্দরী দেবী, চণ্ডীচরণ মিত্র ও লীলা দেবী।

এঁরা ছাড়া কবি নন, অথচ 'ভারতী বৈঠক' বা 'মণিলালের আসরে' নিয়মিত যোগ দিতেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন সৌরীন্দ্র-মোহন মুখোপাধ্যায় (১৮৮৪—), অজিত চক্রবর্তী (১৮৮৬-১৯১৮), চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৭৭-১৯৩৮), সুধীরচন্দ্র সরকার, অমল হোম, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী (১৮৯০—), হরিদাস গঙ্গোপাধ্যায়, প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, মতিলাল গঙ্গোপাধ্যায় এবং চারুচন্দ্র রায়।

কোনও একটি বিশেষ পত্রিকাকে অবলম্বন করে একটি গোষ্ঠী বা দল গঠনের রীতি বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে আরও কয়েকবার দেখা গেছে। কিন্তু 'বঙ্গদর্শন', 'সাধনা' বা 'সবুজপত্রে'র লেখকগোষ্ঠী বিশেষ একজনের প্রতিভা-দীপ্ত আকর্ষণী শক্তির দ্বারাই একত্রিত হয়েছেন— সেখানে সেই একজনই আর সকলকে ফরমাস দিয়ে নিজের মনোমত লেখা লিখিয়েছেন, ফলে বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ বা প্রমথ চৌধুরীর 'স্কুল' সেখানে গড়ে উঠেছে ঠিক, কিন্তু পত্রিকার স্বাধীন ইচ্ছাসম্পন্ন কোন বৈঠক গড়ে ওঠেনি। 'ভারতী' পত্রিকার (এবং পরবর্তীকালে কল্লোল-কালিকলম-প্রগতি) সম্পাদকদ্বয় নিজের প্রতিভা দিয়ে লেখকদের আকর্ষণ করেন নি, এবং সাহিত্যিক হিসাবে সত্য বলতে কি

তাঁদের কৃতিত্ব খুবই কম। তবু তো 'ভারতী' পত্রিকাকে অবলম্বন করে একটি নিবিড় বন্ধুগোষ্ঠী গড়ে উঠেছিল—রবীন্দ্রানুগত্য যদিও তাঁদের প্রধান লক্ষণ, কিন্তু একমাত্র লক্ষণ নয় কখনোই। এই বৈঠকের সাধর্ম্যসূত্রগুলি তাই একে একে উল্লেখ করছি।[8]

১. বয়সের তারুণ্য। ২. নাগরিকতা। ৩. ইংরেজি শিক্ষা। ৪. দেশপ্রেম। ৫. সামাজিক সমস্যা চেতনা। ৬ নারীজাতির প্রতি শ্রদ্ধা। ৭. রোমান্টিক ভাবকল্পনার আতিশয্য। ৮. আদি রসের স্বীকৃতি। ৯. অন্তর্লীন মনের প্রকাশ এবং তৎঅনুষঙ্গী দুর্বোধ্যতা। ১০. শিল্পের জন্য শিল্প মতবাদের সমর্থন। ১১. ছন্দের প্রতি অতি মনোযোগ। ১২. বিদেশী কাব্যের অনুবাদ। ১৩. বিদেশী শব্দ ব্যবহার (বিশেষ করে ফার্সী শব্দ)।

বলাবাহুল্য 'ভারতী'-গোষ্ঠীর সব কবির মধ্যেই এই সবগুলি লক্ষণের দেখা পাওয়া সম্ভব নয়। কারণ ব্যক্তিগত রুচি, শিক্ষা এবং সামর্থ্য অনুযায়ী কবিতাতে ব্যক্তি মনের প্রকাশ অনুপস্থিত ছিল না। যেমন 'ছন্দ সম্পর্কে সত্যেন্দ্রনাথের অতি মনোযোগ, যতীন্দ্রনাথ ও মোহিতলালের দুঃখবাদ, নিসর্গশোভা সম্পর্কে কুমুদরঞ্জন-করুণানিধানের আগ্রহাতিরেক' - অর্থাৎ প্রত্যেক কবিরই নিজস্ব ব্যক্তিত্ব আছে এবং ফলে বিষয়নির্বাচনে পক্ষপাতিত্ব প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও অধিকাংশের মধ্যেই একটা সাধর্ম্য লক্ষ্য করবো[5]—এবং গ্রাম্য ভাব ও নাগরিকতা, আদিরসের আতিশয্য এবং সামাজিক সমস্যা-চেতনা প্রভৃতি দু'একটি লক্ষণের ক্ষেত্রে পার্থক্য দেখা দিলেও অধিকাংশ সূত্রগুলিই 'ভারতী'-গোষ্ঠীর কবিদের উপর সাধারণ ভাবে প্রযোজ্য। রবীন্দ্রনাথকে অনুসরণ তাঁরা করেছিলেন একথা সত্য, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কবিতায় আমরা এই দ্বাদশসূত্রের প্রথম চারটি সূত্রই সাধারণভাবে পেয়ে থাকি—বাকিগুলো থেকে বেশ বুঝতে পারা যায়, বাংলা সাহিত্যে কোনো এক সময়ে, সামাজিক-অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং সাহিত্যিক বিশেষ মূল্যবোধের দ্বারা

পরিচালিত হয়ে কোনো এক কবিগোষ্ঠী ঐ সূত্রগুলিকে গ্রহণ করেছিলেন—যুগগত কারণেই গ্রহণ না করা তাঁদের পক্ষে অসম্ভব ছিল।

এই কবিগোষ্ঠীর কাব্যসাধনা প্রধানতঃ প্রথম মহাযুদ্ধের পরেই বিস্তার লাভ করে। (অবশ্য সত্যেন্দ্রনাথ প্রমুখ অনেকেরই কবি-জীবনের আরম্ভ হয়েছে এই শতাব্দীর একেবারে প্রথম দশকে)। ইংরেজী সাহিত্যের ক্ষেত্রে এই সময়েই আধুনিক কবিতার জন্ম; ১৯১৭ সালে এলিঅটের 'Prufrock and other Observations' প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু বাংলাকাব্যের জগতে এলিঅটীয় মনোভাবের ('I have measured out my life with coffee spoons.') কিছুমাত্র আভাস তখন দেখা যায়নি। অন্যদিকে 'ভারতী'-গোষ্ঠীর কবিমানস ছিল এর তুলনায় সম্পূর্ণ অনাধুনিক। এর কারণ প্রথমতঃ সামাজিক এবং অর্থনৈতিক মূল্যবোধ। প্রথম মহা-যুদ্ধের প্রত্যক্ষ কোনো আঘাত বাঙালীর গায়ে এসে লাগেনি। গ্রাম-নির্ভর সংস্কৃতি অবশ্য ক্রমেই ভেঙে পড়ছিল, কলকারখানার প্রসার সুরু হয়েছে তখন থেকেই, ইংরেজি শিক্ষার হার বেড়ে চলেছে দ্রুত গতিতে। কিন্তু এর ফলে কলকাতার মধ্যবিত্ত নাগরিক সমাজে কোনো জটিলতা সৃষ্টি হয়নি; তখনো বি-এ পাশ করলেই চাক্‌রী পাওয়া সহজ ছিল, এবং অন্ততঃ 'ভারতী'-গোষ্ঠীর উল্লিখিত কবিদের অধিকাংশেরই খাওয়া-পরার ভাবনা ছিল না, বরং আর্থিক সংস্থান ছিল ভালই। স্বদেশী আন্দোলন তখন সুরু হয়ে গেছে পুরোদমে, এবং যদিও কবিরা দেশকে ভালোবাসতেন, কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেননি কোনোদিন। আইন অমান্য করে জেলে যাননি একজনও। এমন কোনো কবিতা লেখেননি যার ফলে সরকারের বিদ্বেষভাজন হবেন। সামাজিক সমস্যার কথা তাঁরা ভাবতেন—সহানুভূতি বোধ ছিল তাঁদের মধ্যে প্রবল—দারিদ্র্য এবং অত্যাচার-অবিচারকে তাঁরা ঘৃণা করতেন, কিন্তু তবু মোটের উপর

নিজেরা উপরতলার মানুষ ছিলেন বলেই সমস্যাগুলি ছিল তাঁদের কাছে বিতর্কের বস্তু, কাব্যের বিষয়। কিন্তু নিজেরা সেই সমাজ সংস্কারের কাজে নামেননি বড়ো একটা। অর্থাৎ সামাজিক এবং অর্থনৈতিক মূল্যবোধের ক্ষেত্রে এমন কোনো পরিবর্তন ঘটেনি যার ফলে তাঁদের মনোজগতে কোনো বিপ্লবাত্মক মনোভাবের সৃষ্টি হবে। আত্মসন্তুষ্ট এবং সুখী মন নিয়ে কবিতা লিখেছিলেন এই 'ভারতী'-গোষ্ঠীর কবিরা।

অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথ বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে এক নিজস্ব জগৎ-সৃষ্টি করেছিলেন—সে জগৎ হলো মানসী, চিত্রা, সোনারতরী, ক্ষণিকা, কথা ও কাহিনী, কল্পনার জগৎ। অদ্ভুত সুন্দর ভাষা—সুদূরচারীমনের প্রকাশ, প্রেম-স্বপ্ন এবং প্রকৃতি প্রীতিঃ এই সব কিছুই সে যুগের বাঙালী কবিদের প্রলুব্ধ করেছিল। অজস্র কবিতা লেখা হতে থাকলো, রবীন্দ্রনাথের অনুকরণে। কবিতা হিসাবে আজকের দিনে যখন এগুলিকে বিচার করি, তখন গভীরতা এবং স্বকীয়তার কিছুটা হয়ত অভাব বোধ করি, কিন্তু তা সত্ত্বেও কবিতাগুলি প্রায়ই সুখপাঠ্য এবং উনিশ শতকের শেষপাদের রবীন্দ্র-অনুকারকদের কবিতা থেকে বহুগুণে উৎকৃষ্ট একথা স্বীকাব করতেই হয়।

২.

রবীন্দ্রনাথ গতিকে স্বীকার করতেন। তাই অখণ্ড কবি-মনের অধিকাবী হয়েও তাঁর কাব্যে পুনরাবৃত্তি নেই। শুধু ছন্দ এবং স্তবকবন্ধের ক্ষেত্রে নিত্য নূতন পরীক্ষাই নয়, এক বৈচিত্র্যধর্মী মন নিয়ে সব কিছুকে দেখেছেন—কখনো বিচরণ করেছেন প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতকাব্য জগতে, কখনো গ্রাম-বাংলার অন্তরঙ্গ ছবি এঁকেছেন, আবার কখনো নির্বিশেষে সৌন্দর্যচেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়েছেন। কিন্তু ১৯০৬-এ 'খেয়া' প্রকাশের পর থেকেই দেখা গেল রবীন্দ্রনাথ ক্রমে পঞ্চেন্দ্রিয়ের আরাধনা ছেড়ে ধ্যান-সুন্দর দৃষ্টিতে জীবনকে দেখা আরম্ভ করেছেন। 'গীতাঞ্জলিতে' এসে রবীন্দ্রনাথ প্রায় অতীন্দ্রিয় উপলব্ধির কথাই ব্যক্ত

করলেন। বলাবাহুল্য সাধারণ বাঙালী পাঠকের কাছে ক্রমেই তিনি অস্পষ্ট হয়ে উঠছিলেন—রবীন্দ্রনাথ বলতেই তাঁরা তখন তত্ত্বময় এক বিশেষ জীবন-দর্শনকে বুঝতেন। সূর্যের অতি নিকটে অবস্থান করে যেমন সূর্যের সম্পূর্ণ ধারণা লাভ করা অসম্ভব, তেমনি রবীন্দ্রনাথের অন্তরঙ্গ শিষ্যমণ্ডলীও রবীন্দ্রনাথের পূর্ণ পরিচয় লাভ করতে পারেন নি। তাঁদের মধ্যে অনেকেই বিশেষ করে যাঁদের ধর্মবোধ ছিল একান্ত আন্তরিক সাধনা, যেমন—কুমুদরঞ্জন মল্লিক (‘শাক্ত’ ‘অঘোরপন্থী’ ‘কাপালিক’ ‘বৈষ্ণব-বন্দনা’ ‘কীর্তন গান’ প্রভৃতি তাঁর অজস্র কবিতার বিষয় নির্বাচন স্মরণীয়), কামিনী রায় (১৮৬৪-১৯৩০), রজনীকান্ত সেন (১৮৬৫-১৯১০), এমন কি করুণা-নিধান বন্দ্যোপাধ্যায়ের মধ্যে পর্যন্ত তাই আধ্যাত্মিক সুরটাই প্রধান ছিল

কুমুদরঞ্জন মল্লিকের একটি কবিতা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করছি, কবিতাটির মধ্যে অনুভূতির অকৃত্রিমতা অত্যন্ত স্পষ্ট—

‘মোদের হরি বংশীধারী, মোদের হরি মাখন চোরা,
যুগল রূপের উপাসী যে, পিয়াসী যে রসের মোরা।
স্মরণে তাঁর পরস মধু, নামে ঝরে পীযুষ ধারা।
মুগ্ধ মোদের মানস-বধূ, পেয়ে তাহার গীতের সাড়া।’ (বৈষ্ণব)

কালিদাস রায়ও এই একই পথে যাত্রা করেছিলেন বলে আমাদের বিশ্বাস (কালিদাস রায়ের কবিতার বিষয়-বৈচিত্র্যের কথা মনে রেখেই একথা বলছি)। এবং সম্প্রতিকালে ‘কুমুদরঞ্জন মল্লিকের শ্রেষ্ঠ কবিতা’র পরিচায়িকা অংশে কালিদাস রায় কুমুদরঞ্জনের কবিতার সমর্থনে যে মন্তব্যটি করেছেন তার মধ্যে কিছু সত্য অবশ্যই আছে—‘এই যুগের বিচারে কুমুদরঞ্জনের একটি অপরাধ তিনি ভক্ত কবি। ভক্তি বস্তুটি এযুগে উপহাস্য। ভক্তি যে প্রেমেরই একটি রূপ, প্রেম যে পুষ্প, আর ভক্তি যে তার ফল, একথা অনেকেই ভুলিয়া

যান। এই প্রেম কেবল তাঁহার অভীষ্ট দেবেরই প্রতি নয়—যাহা কিছু মহৎ, সৎ, পবিত্র, সুন্দর ও অপূর্ব কবির প্রেম তাহারই প্রতি। দেশে দেশে যুগে যুগে—শত শত কবি ভগবানের প্রতি ভক্তি নিবেদন করিয়াছেন, কবি তাঁহাদেরই দলের একজন। ইহাতে যদি তাঁহার অপরাধ হইয়া থাকে তবে তাহা হউক। রসবিমুখ পাঠকদের চেয়ে ভগবান ঢের বড়।'

এখানে বলাই বাহুল্য, কাব্যবিচারে ভক্তির উচ্ছ্বাস দোষও নয়, গুণও নয়—কাব্যবিচারে আদৌ সে'টা ধর্তব্যই নয়। কবিতা হয়েছে কিনা সে'টাই বিচার্য। হৃদয়ের ভাব ও শিল্পের আদর্শ কবি মেলাতে পারলেই তাঁর সার্থকতা।

একটি বিশেষ কবিতার সঙ্গে আর একটি বিশেষ কবিতার তুলনা করে, একটিকে নস্যাৎ করার কোনো অর্থ হয় না। তবু আসল এবং অনুকরণের মধ্যে তুলনা করলে কবি-স্বভাবটা অন্ততঃ বোঝা যাবে। রবীন্দ্রনাথের 'গীতাঞ্জলির' 'সীমার মাঝে অসীম তুমি বাজাও আপন সুর' এবং 'জীবনে যত পূজা হল না সারা' কবিতা দুটির সঙ্গে কুমুদরঞ্জন মল্লিক এবং কালিদাস রায়ের দুটি শ্রেষ্ঠ কবিতা এক সঙ্গে পড়লে এই পার্থক্য সহজেই অনুভূত হবে। (রবীন্দ্রনাথের এই 'খেয়া'-'গীতাঞ্জলি'র প্রায়-আধ্যাত্মিক কবিতাগুলির মধ্যেও অসাধারণ শব্দ-সম্ভার, দ্রুত উপমা-চিত্রকল্পের পরিবর্তন এবং অল্পকথার মধ্যে অনেক-খানি ব্যঞ্জনা আজও আমাদের আকৃষ্ট না করে পারে না)।

কুমুদরঞ্জন মল্লিক ঃ

'ফোটার পুলক স্মরায় ঝরার ব্যথা
ফুল চায় তার ফোটার সার্থকতা।
সে খোঁজে না কোথা আছে মুক্তির চাবি
কেবল পূজার অধিকার করে দাবী,
দেবতা তাহার যেথা আছে যায় তথা।'—(পূজা)

কালিদাস রায় ঃ

"গন্ধে মিলাইল ধূপ অরূপ হইল রূপ অনির্বচনীয়,
ইন্দ্রিয়ের রসনায় ভাবে হয়ে নিমগন হলো অতীন্দ্রিয়।
উঠিল শ্রীরাধিকার বুকফাটা হাহাকার বিদারি গগন,
'কোথা গেলে রসরাজ দশমী দশায় আজ দাও দরশন'
কাঁদে তায় প্রতিশাখী গোকুলের মৃগ-পাখী রাধিকার শোকে
কাঁদে গোপ-গোপী যত, অশ্রু ঝরে অবিরত জটিলারও চোখে।
অরূপ ফেরেনি রূপে গন্ধ ফিরেনিক ধূপে, শ্যাম বৃন্দাবনে।
তাই আজো রাধিকার আর্তনাদ হাহাকার বাজিছে ভুবনে।" (বৈকালী)

'ভারতী'-গোষ্ঠীর মূল কাব্য-ভাবনা কিন্তু ভক্তিরসাশ্রিত নয়। আসলে এই আধ্যাত্মিক মার্গের কবিরা যদিও 'ভারতী'তে লিখতেন এবং নানাকারণে বাঙালী পাঠকমণ্ডলীর কাছে বেশি জনপ্রিয় হয়েছেন, তবুও তাঁদের মনে এমন একটা আত্যন্তিক প্রাবীণ্যভাব ছিল, যার ফলে রূপ-নির্ভর এবং তরলছন্দে মিষ্টি কবিতা তাঁরা কখনো কখনো লিখলেও 'ভারতী'র তরুণ, উচ্ছ্বাসযুক্ত এবং 'কবিতার জন্য কবিতা' এই মতে বিশ্বাসী কবিদের সঙ্গে তাঁদের বিশেষ আন্তরিক যোগ ছিল না। আর একটু স্পষ্ট করে বলি, 'ভারতী'-গোষ্ঠীর কবিদের মধ্যে নাগরিক-মনের প্রকাশ একান্ত প্রধান। কুমুদরঞ্জন-কালিদাস প্রমুখ কবিরা নগরকে এঁদের মতো ভালবাসেননি, বাসতে পারেননি,[৬] অন্যদিক দিয়ে বিচার করলে দেখবো এঁদের মনের গঠন আসলে অনেকটাই প্রাচীন-পন্থী। প্রাচীনপন্থী বলছি এই অর্থে যে কাব্যকে এঁরা জীবনের থেকে বিযুক্ত করে দেখেছেন, ধর্ম কিংবা নীতি, জ্ঞান কিংবা ভক্তিই এঁদের কবিতা লিখতে উদ্বুদ্ধ করেছে(কালিদাস রায়ের কবিতা পড়ে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন—'তোমার এই কাব্যগুলি পড়িলে বাংলার ছায়া শীতল নিভৃত আঙিনার তুলসীমঞ্চ ও মাধবীকুঞ্জ মনে পড়ে')। পরবর্তী-কালে মোহিতলাল মজুমদার এঁদের কবিত্বের মধ্যে 'বাঙালীত্বে'র প্রতিষ্ঠা দেখেই উচ্ছ্বসিত হয়েছিলেন।[৭] বলাবাহুল্য বাঙালীর

গ্রামীন সংস্কৃতির সঙ্গে এই যোগই এঁদের বিশিষ্টতা দিয়েছে—এবং আজও যখন এঁদের লেখা কোনো কবিতা আমাদের ভালো লাগে তখন তার কারণ, এঁদের কবিতায় প্রকাশিত 'জন্মভূমির প্রতি বাংলার প্রতি, সংস্কৃতি ও মানুষের প্রতি গভীর প্রেম।'[৮]

৩.

'ভারতী'-গোষ্ঠীর কাব্যসাধনা বলতে আসলে বলতে চাইছি মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, হেমেন্দ্রকুমার রায়, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, কিরণধন চট্টোপাধ্যায়, যতীন্দ্রমোহন বাগ্‌চী প্রভৃতির কবিতা। এরা সকলেই সমান বিখ্যাত কবি নন, এবং সকলেই কিছু ভালো কবিতাও লেখেন নি। তবু 'ভারতী'-গোষ্ঠীর সাধারণ লক্ষণ যেগুলি নির্দেশ করেছি, এঁদের কবিতায় সেগুলি প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যাবে। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ছিলেন এঁদের মধ্যমণি। এই গোষ্ঠীর অনেকে শুধু একান্তভাবে সত্যেন্দ্রনাথেরই অনুকরণ করেছেন সারাজীবন (যেমন কিরণধন চট্টোপাধ্যায়), বলাইবাহুল্য তার ফল অত্যন্ত শোচনীয় হয়েছে। কিন্তু একটা জিনিষ আমার বিশেষভাবে মনে হয়েছে, এঁদের কবিতা পড়তে পড়তে—বয়সে এবং মনে এঁরা অত্যন্ত তরুণ ছিলেন, এবং এঁদের কবিতায় আশ্চর্য একটা সজীবতা আছে যা হয়তো 'বলাকা' পর্বে রবীন্দ্রনাথকেও কিছুটা প্রভাবিত করেছিল। এই তরুণ কবিরা জীবনের দুঃখকে অস্বীকার করেননি, কিন্তু যৌবনের আশাবাদ (রবীন্দ্রনাথের 'আনন্দবাদ' নয়) এবং স্বপ্ন নিয়ে খুশির গান গেয়েছেন—

> 'এ-মাটিতে ফল ফুল নাই যেন ফললো,
> কাঁটাগাছে বিলকুল চারদিক ভরলো।
> সেজন্য নিরাশায় হরদম কাঁদবো?
> ভাগ্যদেবীর পায়ে মাথা খুঁড়ে সাধবো?
> থেঁতলে দিক্ ছিঁড়ে নিয়তির চক্র
> দুনিয়ার লোক থাক্ করে মুখ বক্র

কক্‌খনো চোখে জল উঠ্‌বেনা চল্‌কে
যত দিন ঘরে আছে ভাঙা হুঁকো কল্‌কে।
আর আছে আল-ঝাল টক্‌টক্ মিষ্টি
প্রিয়া মোর বুক ভরা—আলো করা সৃষ্টি।'
—('ভারতী', অগ্রহায়ণ ১৯২৬)

কিরণধনের এই আপাতলঘু পদ্যটির মধ্যেই আমরা 'ভারতী'-গোষ্ঠী কবিদের মন খুঁজে পাবো। পরবর্তীকালে নজরুল এবং 'কল্লোলীয়' কবিরাও এই একই প্রেরণায় তারুণ্যের জয়গান গেয়েছিলেন। হেমেন্দ্রকুমার রায়ের 'পথপাগলের গান' কবিতাটিও এই প্রসঙ্গে স্মরণ করতে পারি—

"মোদের হৃদয় বেদান্তেরি 'জগৎ মায়া'—সূত্র ভরা
সে-সব ওরা হেসেই ওড়ায়, ভোগঅমৃতের পুত্র ওরা।
শাস্ত্র নিয়ে আমরা লড়ি, ওরা লড়ে অস্ত্র নিয়ে
অস্ত্র দেখেই শাস্ত্র ছেড়ে পড়ি গলাবস্ত্র দিয়ে।
ভোগের কোলে বসে তবু ত্যাগের বুলি মুখে ছোটে
কিন্তু চেঁচাই ভেড়ার মতন দুঃখ যখন বুকে ফোটে।
ভক্ত বিটেল নয়কো ওরা নেইকো ওদের ও রোগ জানা
হরিনামের ঝুলির ফাঁকে দেয় না উঁকি মোরগ ছানা।
পষ্ট বলে চাই দুনিয়া। আমরা মানুষ তরুণ মানুষ।
কল্পলোকের গগন পরে উড়িয়ে দেব অরুণ ফানুস।'
—('ভারতী' আশ্বিন ১৩২৯)।

৪.

'ভারতী' পত্রিকার প্রবীণ এবং নবীন সব কবিই রবীন্দ্রনাথের অনুকরণ করেছিলেন, এবিষয়ে কারোরই দ্বিমত নেই। তবে এই অনুকরণ প্রত্যেক কবির ব্যক্তিগত প্রবণতা অনুযায়ী বিভিন্নমুখী। রবীন্দ্রনাথের সোনারতরী, চিত্রা, ক্ষণিকা এবং কল্পনার ভাববস্তুই বেশি অনুকৃত হোতো। ছন্দের ক্ষেত্রে ধ্বনিপ্রধান ছন্দের ব্যবহার বেশী হয়েছে। অবশ্য সত্যেন্দ্রনাথের অনুসরণে অনেকেই ছড়ার ছন্দে কবিতা

লেখার প্রয়াসী হন, কিন্তু এঁদের অধিকাংশ কবিতারই ব্যর্থতার কারণ ছড়ার ছন্দের দ্রুত এবং লঘু চাল,—সত্যেন্দ্রনাথ অনেক গম্ভীর বিষয় এই ছন্দে লেখার ফলেই সেগুলি হাস্যকর একটা প্যারডিতে পরিণত হয়েছে। অন্যদিকে পয়ার ছন্দের পরীক্ষায় রবীন্দ্রনাথ যে অসামান্য সাফল্য দেখিয়েছেন এবং বর্তমানে আধুনিক কবিতা যার উপর দাঁড়িয়ে আছে, সেই পয়ার ছন্দে এই কবিরা কোনই কৃতিত্ব দেখাতে পারেননি। করুণানিধান প্রমুখ অনেক কবি প্রাচীন পয়ার ত্রিপদীতে কবিতা লিখেছেন, যা ভারতচন্দ্রকে মনে পড়িয়ে দেয়। আসলে রবীন্দ্রনাথ যেখানে পরিণতি লাভ করেছেন, তা সে উপলব্ধির গভীরতাতেই হোক অথবা ছন্দের নিপুণতাতেই হোক এই কবিরা সেখানে পৌঁছুতে পারেন নি। 'ভারতী'-গোষ্ঠীর কবিদের কাব্য সাধনার শেষ সীমা থেকেই রবীন্দ্রনাথের কাব্যসাধনার আরম্ভ। সেইজন্যই রবীন্দ্রনাথ প্রতিমুহূর্তেই এগিয়ে চলতে পেরেছেন -বয়সে প্রবীণতম হয়েও আঙ্গিকের প্রয়োগে তিনি 'ভারতী'-গোষ্ঠীর কবিদের বহু পিছনে ফেলে 'কল্লোলীয়'দের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। এই প্রসঙ্গে স্মরণ যোগ্য যে, 'ভারতী' পত্রিকায় এই সময়েই রবীন্দ্রনাথ তার গদ্যছন্দে লেখা 'লিপিকা'র কবিতাগুলি প্রকাশ করেন, 'প্রশ্ন' 'অক্ষমতা' (আশ্বিন ১৩২৬) 'সতেরোবছর', 'কৃতঘ্নশোক' (কার্তিক ১৩২৬), 'কথিকা' (বৈশাখ ১৩২৭) প্রভৃতি। রবীন্দ্রনাথ পরবর্তীকালে লিখেছেন যে এই সময় তিনি নাকি সত্যেন্দ্রনাথের অসাধারণ ছন্দো-নৈপুণ্য দেখে তাঁকে গদ্যছন্দে কবিতা লিখতে অনুরোধ করেন— কিন্তু সত্যেন্দ্রনাথ এই পরীক্ষাকার্যে ব্রতী হননি কোনোদিন, ফলে রবীন্দ্রনাথের শেষজীবনে আমরা পেলুম 'পুনশ্চ'-'শ্যামলী'র মত আশ্চর্য কবিতা। আসলে সত্যেন্দ্রনাথের মনের গঠনই ছিল শিশুসুলভ, একমাত্র ছড়ার ছন্দেই তাঁর কান সম্পূর্ণ তৃপ্তি পেতো, এবং বিশেষ করে গদ্যছন্দের কবিতাতে যে মননদীপ্ত মনের প্রকাশ বাঞ্ছনীয় তা সত্যেন্দ্রনাথ বা তাঁর সমকালীন কবিগোষ্ঠীর ছিল না। (সেযুগে

এব একমাত্র ব্যতিক্রম প্রমথ চৌধুরী। তিনি 'ভারতী' পত্রিকায় এককালে কিছু কিছু কবিতা লিখলেও আলোচ্য 'মণিলালেব যুগে' ভাবতীতে একটিও কবিতা লেখেন নি। এব কাবণ 'ভাবতী'-গোষ্ঠীর কবিদেব সঙ্গে তাঁব মানস সাধর্ম্য ঘটেনি)।

ববীন্দ্রনাথেব অনুকবণ কত গভীব ভাবে এবং কত বিচিত্রভাবে সেযুগে অনুশীলিত হযেছে তাবই নিদর্শন স্বরূপ এইবাব আমবা কিছু কবিতা উদ্ধৃত কববো। আবাব বলি, এগুলিব আত্যন্তিক মূল্য কবিতা হিসাবে কিছু নেই, কিন্তু বাংলা কবিতাব ইতিহাসে এদের ঐতিহাসিক মূল্য অনস্বীকার্য।

১। দ্বিজেন্দ্রনাবাযণ বাগ্চী : 'জীবন দেবতা'।

(দ্রঃ ববীন্দ্রনাথেব 'জীবনদেবতা,)[৯]

জানি না সে কোন পুরাতন কিসেব টানে
প্রতিক্ষণে আপনারে নূতন করে গড়ে
সৃজন স্রোতেব বিপুল ধারা কোন আনন্দে ছুটে
নিমেষ হতে নিমেষ পরে পড়ে।'
—('ভাবতী', জ্যৈষ্ঠ ১৩২৯)।

২। সুখবঞ্জন বায় : 'তুমি এস'।

'ওগো তুমি এস, নবীন ববষে
নভো নীল হতে আপনা হরিয়া -নামিয়া এস।
নদী হয়ে কত চলিবে বহিয়া,
ইন্দ্রধনুর বরণ আঁকিযা
গগনে গগনে উদ্দেশহীনা
ভ্রমিবে কত ছায়ার মত। —('ভারতী', জ্যৈষ্ঠ ১৩১৭)।

৩। হেমলতা দেবী : 'জাগাও'।

'জাগাও, জাগাও
মম অন্তর আলোকে তব আলোক মিলাও।
মম অজানা বেদন,
মম অফুট চেতন
তব আলোক কিরণে
এবে—ফুটাও ফুটাও।' ('ভারতী', আষাঢ় ১৩১৭)।

৪। মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ঃ 'ফুলশয্যায়'।

'ফুলের পর ফুল জমেছে
ফুলের স্বপন পারা—
একটি কুঁড়ি গোপন আছে
তারি মাঝে হারা।
সরম তার ঢেকে আছে
সঙ্কোচে সে নত
বুকের মাঝে গন্ধটুকু
ঘুমিয়ে চেতনহত।' ('ভারতী', ১৩২৩)।

৫। হেমেন্দ্রকুমার রায়ঃ 'ঋতুর পালা'।

(দ্রঃ রবীন্দ্রনাথের 'ঋতুরঙ্গশালা')

'শরৎ ভোরে মরত ভরে
মন ভুলিয়ে
চপল
আসে।
বাদল-মেঘে থামিয়ে মাদল
বন ডুলিয়ে
শ্যামল
শ্বাসে।'...ইত্যাদি ('ভারতী', বৈশাখ ১৩৩০)।

৬। নরেন্দ্র দেবঃ 'জামাই'। (দ্রঃ রবীন্দ্রনাথ, 'পলাতকা',)

'এই তো সবে প্রথম বিয়ের পর
ছটি মাসও হয় নি আজও, গেছে শ্বশুর ঘর
আমার মেয়ে টুনি
এর মধ্যেই শুনি
নানান জনে নানান কথা কয়,
শাশুড়ী তার মোটেই নাকি মানুষ ভাল নয়
মেয়েটাকে দিচ্ছে শতেক জ্বালা;
কোল থেকে তার কেড়ে নে যায়
বেড়ে দেওয়া মুখের ভাতের থালা।'. ইত্যাদি
('ভারতবর্ষ', আশ্বিন ১৩২৯)।

৭। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত : 'ওগো'। (দ্রঃ রবীন্দ্রনাথ 'ক্ষণিকা')

"বলব ভাবি 'প্রিয়া' 'প্রাণেশ্বরী'
ছেড়ে দিয়ে 'শুনছ ?' 'ওগো' হাঁগো'
বলতে গিয়ে লজ্জাতে হায় মরি
ও সম্বোধন ওদের মানায় নাকো।
ওসব যেন নেহাৎ থিয়েটারী—
যাত্রা দলের গন্ধ ওতে ভারি ;
'ডিয়ার'টাও একটু ইয়ার-ঘেষা
পিয়ারা' সে করবে ওরে খাটো ;
এর তুলনায় 'ওগো' আমার খাসা
যদিও মানি ওটি ঈষৎ মাঠো।"

('ভারতী', জ্যৈষ্ঠ ১৩১৯)।

এই প্রসঙ্গে একটা মজার জিনিষ মনে পড়ছে। অনুকরণ করতে করতে কবিরা যে কত বেশি যান্ত্রিক হয়ে পড়েছিলেন সেই সময়ে—এবং অনুভূতি-উপলব্ধি দুইই বিসর্জন দিয়ে পাঠক এবং সম্পাদকের চাহিদা অনুযায়ী নিয়ম মাফিক কবিতা লিখতেন, তার দৃষ্টান্ত পাবো 'ভারতী'র যে কোনো বছরের (শুধু 'ভারতী' নয়, সমকালীন অন্যান্য পত্রিকাতেও) আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে অন্ততঃ আধডজন বর্ষার কবিতা এবং আশ্বিন-কার্তিকমাসে ঐরকম শরৎবন্দনার কবিতা থাকবেই। অবশ্য রবীন্দ্রনাথও এই নিয়মের ব্যতিক্রম ছিলেন না, এবং মোটের উপর তাঁর কবিতাগুলি অবলম্বন করেই অন্যদের হৃদয়োচ্ছ্বাস পত্রিকার পাতায় প্রবাহিত হতো। যেমন, রবীন্দ্রনাথ যেই লিখলেন 'বরষা' ('আজ বরষার রূপ হেরি মানবের মাঝে') নামে একটি কবিতা,[১০] অমনি সেই সংখ্যাতেই আরও প্রকাশিত হলো—'বর্ষাগমে', 'বর্ষাপ্রভাত'—প্রিয়ম্বদা দেবী। 'শতদল' ('আজি ভরা শ্রাবণের অবিশ্রান্ত ধারে')—ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত। 'বর্ষা' সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত। 'প্রেম' ('আজ রাতে যবে ঝরঝর ধারে বাদল

ঝরিছে মেঘে')—যতীন্দ্রমোহন বাগচী। আবার রবীন্দ্রনাথ আশ্বিন সংখ্যায় লিখলেন 'শারদা' ('ওগো শেফালি বনের মনের কামনা') আর সেই সঙ্গেই ছাপা হলো, 'সরোজ বাসিনী'—দেবেন্দ্রনাথ সেন। 'আগমনী' —প্রিয়ম্বদা দেবী। 'শারদ গীতি'—হিরণ্ময়ী দেবী। 'শারদলক্ষ্মী'—সুখরঞ্জন রায়। 'শরতের গান' 'শরৎসুন্দরী'—সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত। এঁদের প্রতি ইঙ্গিত করেই প্রমথ চৌধুরী সেই সময়ে লিখেছিলেন--'যেহেতু কবিতা গান থেকেই উৎপন্ন হয়েছে সে কারণে সাহিত্যে সময়োচিত কবিতা লেখবারও ব্যবস্থা আছে। মাসিকপত্রে পয়লা বৈশাখে নববর্ষের কবিতা, পয়লা আষাঢ়ে বর্ষার, পয়লা আশ্বিনে পূজার, আর পয়লা ফাল্গুন প্রেমের কবিতা বেরোনো চাই-ই চাই। এই কারণে আমার পক্ষে বর্ষার কবিতা লেখা অসম্ভব। যে কবিতা আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে প্রকাশিত হবে, তা অন্ততঃ জ্যৈষ্ঠ-মাসের মাঝামাঝি রচনা করতে হবে। আমার মনে কল্পনার এত বায়ু নেই যা নিদাঘের মধ্যাহ্নকে মেঘাচ্ছন্ন করে তুলতে পারে। তাছাড়া যখন বাইরে অহরহ আগুন জ্বলছে তখন মনে বিরহের আগুন জ্বালিয়ে রাখতে কালিদাসের যক্ষও সক্ষম হতেন কিনা সে বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে।'[১১]

৫.

কিন্তু আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে, যদিও 'ভারতী'-গোষ্ঠীর কবিরা একান্তই অনুকারক কবি, তাহলেও রবীন্দ্রনাথের প্রতি এঁদের শুধু আন্তরিক মোহ-ই ছিল না, আন্তরিক অনুরাগও ছিল। আজকে একথা ভাবতেও ভয় হয় যে, এঁরা যদি রবীন্দ্রনাথকে অনুসরণ না করে মাইকেল কিংবা নবীন সেনকে অবলম্বন করেই ফুরিয়ে যেতেন, তাহলে বাংলা কবিতার বিবর্তনের ধারাই হয়তো অন্যপথ নিত। প্রথমশ্রেণীর কবিপ্রতিভা এদের কারোর ছিল না, কিন্তু তবুও এঁদের সাধনা অবিচলিত ছিল যুগান্তরালের মধ্যেও। রবীন্দ্রনাথের কবিতার বই যে যুগে সিকি দামেও বিক্রী হতো না, কাব্যবিশারদের বিদ্রূপ

যখন বাঙালী পাঠককে আমোদ যুগিয়েছিল (রবীন্দ্রনাথের নোবেল প্রাইজ পাওয়ার আগের কথাই অবশ্য বলছি), সেযুগে মাইকেল-হেম-নবীনের পথ ধরে এগোলে এই কবিরা আরও অনেক বেশি জনপ্রিয়তা লাভ করতে পারতেন সন্দেহ নেই। কিন্তু জনপ্রিয়তার আকর্ষণে নয়, বই বিক্রীর লোভে নয়,—নিত্য কটূক্তি এবং বিদ্রূপবাণকে স্বীকার করে নিয়ে যে কবিগোষ্ঠী একান্তভাবেই রবীন্দ্রনাথকে আপনজন মনে করে হৃদয়ের নিভৃতে দেবতার আসন দিয়েছিল, তাঁদের কলম যতই দুর্বল হোক না কেন, তাঁদের জীবনে কোনো মিথ্যাচার ছিল না। রবীন্দ্রনাথকে অনুকরণ করা সহজ মনে করেই এঁরা তাঁকে অনুকরণ করেন নি, আসলে রবীন্দ্র-কবিমানসের সঙ্গেই ঘটেছিল তাঁদের মানস সাধর্ম্য।

সেইসময় 'সাহিত্য' পত্রিকা ছিল বিশেষভাবে রবীন্দ্রবিরোধী সাহিত্যিক গোষ্ঠীর মুখপত্র। ঐতিহাসিক কৌতূহল মেটাবার জন্য, 'সাহিত্যে'র 'মাসিক সাহিত্য সমালোচনায়' 'ভারতী' পত্রিকার কবিগোষ্ঠী কিভাবে সংবর্দ্ধিত হতো তার নিদর্শন কিছুটা উদ্ধৃত করছি। একটু তলিয়ে দেখলেই বেশ বোঝা যাবে, সমাজপতি মহাশয়ের আসল আক্রমণ 'ভারতী'র কবিগোষ্ঠী নয় - তাঁদের পশ্চাতে অবস্থিত রবীন্দ্রনাথই এই বিদ্রূপের যথার্থ লক্ষ্য।—

'মাসিক সাহিত্য সমালোচনা' [১২]

ভারতী, চৈত্র॥ শ্রীযুক্ত কালিদাস রায় 'সুন্দর' নামক তথাকথিত কবিতায় ধমক দিয়াছেন—'কে বলে তোয় কালো?' ইহার উপর আর কথা চলে না। কালো নয়, আলোই বটে। এতদিন কবি, কবির মানসী, প্রজাপতি, চাঁদিনী, যামিনী প্রভৃতি পুষ্পরেণু মাখিতেন, সাহিত্যেও ছড়াইয়া দিতেন। কিন্তু কবি কালিদাস মৌলিক প্রতিভার আশীর্বাদে 'চন্দ্ররেণু' প্রস্তুত করিয়াছেন। কবি মেঘকে বলিয়াছেন—

'ইন্দ্রধনুর স্বপন দেখিস,
চন্দ্ররেণু গায়ে মাখিস।'

উদ্ভাবনী শক্তির পরকাষ্ঠা বটে। আশীর্বাদ করি, যে হামানদিস্তায় কবি কালিদাস চাঁদ চূর্ণ করিয়াছেন, তাহা অক্ষয় হইয়া থাকুক। কবিরাজ মহাশয়েরা তাঁহাদের 'দশন-কান্তি-চূর্ণে' কালিদাসের চাঁদচূর মিশাইয়া দিন,—তাহা হইলে জয়দেবের 'দন্তরুচিকৌমুদী' বহু দন্ত পাটিতে সমুদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে। ত্রিবেদী ভায়া পরিষদের চিত্র-শালায় এই হামানদিস্তাটি সংগ্রহ করিয়া রাখুন। বালখিল্য কবিরা এই 'চাঁদচূর' সেবন করুন, উপকৃত হইবেন।—বাঙ্গালায় কবিশালার প্রতিষ্ঠা অত্যন্ত আবশ্যিক হইয়া উঠিল। রবীন্দ্র-সংবর্দ্ধনার চাঁদা হইতে রবীন্দ্রনাথের নামে কোনও শীতশীতল প্রদেশে এইরূপ একটি আশ্রম বা কবিনিকেতন বা 'রবীন্দ্রচন্দ্রচূর' প্রতিষ্ঠিত করিলে হয় না? রবীন্দ্রনাথই এই চন্দ্রচূরস্কুলের সৃষ্টিকর্তা, তাই তাঁহার নামটাও জুড়িয়া দিতে বলিতেছি।···

প্রবাসী, চৈত্র॥ শ্রীযুক্ত কালিদাস রায় রবীন্দ্রনাথের সেই পলাতক মানসপুত্রকে—বিশারদ যাহাকে বেতাইয়া দেশছাড়া করিয়াছিলেন—খুঁজিয়া আনিয়া আবার বাঙ্গালার কাব্যি-কচুবনে 'বসন্তকাননরাণী'র অধিকারে ছাড়িয়া দিয়াছেন। এই নিন সেই হারানিধি। 'মুবছিছে ঢেউগুলি তার চরণতলে পুলকে।' পূর্বে 'পুলক' গাছে গাছে নাচিত, এখন পুলকিত ঢেউ বাঙ্গালা সাহিত্য প্লাবিত করিতেছে। ক্ষতি নাই।··· 'উর্ণনাভের স্বর্ণজালের ওড়নায়' নবীন কবি সত্যেন্দ্রনাথের মানসীর দেহসৌরভ যে এখনও ছড়াইয়া আছে। তবে একজন আচার্য বলিয়া গিয়াছেন বটে 'পরকীয়া না হইলে রস হয় না।' তা ওড়নাই সই। 'উর্ণানাভ' নয়, উর্ণনাভ। ভেড়ার উর্ণা আছে, মাকড়সার নাই, এইটুকু মনে রাখিলে ভবিষ্যতে আর গোল বাধিবে না।

৬.

'ভারতী'-গোষ্ঠীর কবিরা সকলেই অল্পবিস্তর ইংরেজী শিক্ষিত এবং সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত প্রমুখ অনেকেই ফরাসী ভাষার সঙ্গেও পরিচিত ছিলেন। বিদেশী কাব্য এই তরুণ কবিদের একান্তভাবে আকৃষ্ট

করেছিল। অনুবাদ এঁরা অনেকেই করতেন। কখনো জ্ঞাতসারে, কখনো অজ্ঞাতে। কারণ এঁদের নিজেদের বক্তব্যবিষয় ছিল খুবই সীমিত (সেই সঙ্গে অন্যভাষায় অজ্ঞ সাধারণ বাঙালী পাঠককে নতুন স্বাদ দেওয়া এবং নিজের বিভিন্ন ভাষা-জ্ঞান জানাবার উদ্দেশ্যেও এঁরা কবিতা অনুবাদ করতেন)। কিন্তু তবু বিদেশী কবিতার ভাব অপহরণ করার মধ্যে দিয়েই এই কবিদের একটি বিশেষ মনের পরিচয় পাওয়া যায়। ইংরেজী এবং ফরাসী রোমান্টিক কাব্যধারা তাঁদের ভালো লাগতো, বিশেষ করে সেই সব কবিতা যার মধ্যে নিছক সৌন্দর্য-বৃত্তিই বিকশিত হয়েছে। আর সেই সঙ্গে আশ্চর্যের বিষয় এই যে শেলী-কীটস্ কিংবা ভেলের্ন বা ভালেরী যদিও এঁদের ভালো লাগতো, কিন্তু রোমান্টিক যুগের কবিতার মর্মকথা সম্ভবতঃ এঁদের অজ্ঞাত ছিল। লালপরী, নীলপরী কিংবা জর্দাপরীর কল্পনা-বিলাস মনে অজস্র চিত্রকল্পের সৃষ্টি করতো—কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় সেই কল্পনার মধ্যে গভীরতা ছিল না, ফলে অখণ্ড একটি ভাবরূপের সৃষ্টি হয়েছে খুব কমই। অনুরূপ কারণেই কীট্সের 'লা বেল দাম সঁ মার্সি' কবিতার অনুবাদ করতে গিয়ে সত্যেন্দ্রনাথ ভীষণভাবে ব্যর্থ হয়েছেন—শব্দ এবং অন্বয়ের ব্যবহারে যে কৃত্রিমতা আমাদের চোখে ঠেকে, তার আসল কারণ নিশ্চয়, বোধের আন্তরিকতা এবং প্রকাশের অকৃত্রিমতার অভাব। বিদেশী কবিতার যে সব অংশে অনুভূতির সূক্ষ্মতা এবং তীব্রতা প্রকাশিত সে সব স্থানে এঁরা সেই আবেগকে প্রায়ই বাংলা কবিতায় অনুবাদ-বেদ্য করতে পারেন নি। আসলে রোমান্টিক-ইম্যাজিনেশন এঁদের ছিল না, রোমান্টিক-ফ্যান্সির পসরা সাজিয়ে বসেছেন এঁরা। রোমান্টিসিজ্মের জন্ম যে যন্ত্রণার মধ্যে, সেই যন্ত্রণা এই যুগের কবিরা অনুভব করেন নি।

বিস্ময় এবং সৌন্দর্যে অভিভূত হয় মন, অথচ হৃদয়ের আর্তি কাব্যে প্রকাশিত হয় না,—এইদিক দিয়ে এই কবিগোষ্ঠীর সঙ্গে, (বিশেষ করে সত্যেন্দ্রনাথ-কিরণধন-মণিলালের কবিতা) ইংরেজী প্রির্যাফেলাইট

কবিগোষ্ঠীর বিভিন্নমুখী সাদৃশ্য চোখে পড়ে। 'ভারতী-গোষ্ঠীর কাব্য-সাধনার কাল অর্থাৎ এই শতাব্দীর প্রথম তিন দশকে পৃথিবীর রাজনৈতিক-সামাজিক এবং অর্থনৈতিক মূল্যবোধের ক্ষেত্রে প্রচুর পরিবর্তন দেখা দেয়। প্রির‍্যাফেলাইট কবিদের কাব্যসাধনার আরম্ভ স্মরণীয় ১৮৪৮ খ্রীস্টাব্দে। এই সময়েই ফরাসীদেশে বিদ্রোহের আগুন জ্বলেছে, লুই ফিলিপ সিংহাসন হারিয়েছেন, হাঙ্গেরী-অস্ট্রিয়া-পোলাণ্ড এবং ইটালীতে জন-বিক্ষোভ দেখা দিয়েছে। এই সালেই মার্ক্স-এঙ্গেল্‌সের কম্যুনিষ্ট ম্যানিফেস্টোর প্রথম প্রকাশ। ইণ্ডাস্ট্রিয়াল রেভল্যুসনের পরবর্তী ফল হিসেবেই ইংল্যাণ্ডে শ্রমিকদের মধ্যে যে অসন্তোষ জমা হচ্ছিল তা চার্টিস্ট অভ্যুত্থানের মধ্যে প্রকাশিত হলো। সমাজের উপরতলার মানুষদের মনে এই গণবিপ্লব যে আতঙ্ক এবং ভীতির সৃষ্টি করেছিল তারই আভাস পাই ১৮৪১ খ্রীস্টাব্দে 'বার্ণাবি রুজ'-এ। 'এ টেল অফ টু সিটীজ' (১৮৫৯)-এ অত্যাচারের বীভৎস যে রূপটি দেখি, তাই-ই তাঁদের মনে দুঃস্বপ্নের মত বিরাজ করতো এবং তার দশ বছর পরেও আর্ণল্ডের 'কালচার এ্যাণ্ড এ্যানার্কী'র মধ্যে এর স্পষ্ট ইঙ্গিত আছে। কিন্তু পারিবারিক অস্বস্তির কারণ একমাত্র রাজনৈতিক ঘটনাগুলিই নয়, ১৮৪৮-এ অতি-যান্ত্রিকতার বিষময় ফলের সঙ্গে সঙ্গে কলেরার মহামারীরূপে আত্মপ্রকাশ, সামাজিক জীবনের রীতিনীতিকে বিধ্বস্ত করে দিয়েছিল। প্রির‍্যাফেলাইট কবিদের সময় সম্বন্ধে এত কথা বলার কারণ এই যে, রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক এবং সামাজিক মূল্যবোধের ক্ষেত্রে প্রবল পরিবর্তন দেখা দেওয়া সত্ত্বেও এই কবিরা বাস্তব পৃথিবীর জীবনবোধ দ্বারা উদ্বুদ্ধ না হয়ে কল্পনাবিলাসের রামধনু সৃষ্টি করে চলেছিলেন।[১৩] অবশ্য 'ভারতী'-গোষ্ঠীর কবিদের মতই প্রির‍্যাফেলাইট কবিরাও সমাজজীবন সম্বন্ধে একেবারে অনবহিত ছিলেন না—পিয়ানোর তুল্‌তুল্‌ টুক্‌টুক্‌ ধ্বনি উপভোগের সঙ্গে সঙ্গে এঁরা পতিতার দুঃখে বিগলিত হয়েছেন, মেথরকে নিয়ে উচ্ছ্বসিত হয়েছেন, চরকা-আন্দোলনকে সমর্থন জানিয়েছেন, তেমনি

প্রিব্যাফেলাইট কবিরাও মুখে বারবার 'আর্ট ফর আর্টস্ সেক' বলা সত্ত্বেও তাঁদের কবিতায় ভ্রষ্টানারীর জীবনবেদনা এবং সমাজের প্রতি তীব্র আক্রমণ দেখা গেছে।[১৪] 'পঞ্চেন্দ্রিয়ের পঞ্চপ্রদীপ' জ্বেলে সৌন্দর্যের আরাধনা করেছেন এই দুই গোষ্ঠীর কবিরাই। বস্তুর ভাবরূপ নয়, তার ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপটি ফুটিয়ে তোলাতেই ছিল এঁদের আনন্দ। আর তার জন্য সূক্ষ্মবর্ণ বৈচিত্র্য—উজ্জ্বল রঙের ব্যবহার এবং বর্ণনায় ক্ষুদ্রতম বিবরণ তাঁরা দিয়েছেন। প্রিব্যাফেলাইট চিত্রকলার মধ্যেও এই বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। (উইলিয়াম মরিসের স্ত্রী জেন মরিসের আঁকা দুটি বিখ্যাত তৈলচিত্রের কথা মনে পড়ছে : 'প্রসারপিন্' এবং দি 'বিলাভেড')। ছন্দের অসংখ্য পরীক্ষা-নিরীক্ষাও এই কাব্যসাধনারই অন্তর্গত। অর্থাৎ প্রকাশ বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়ে এঁদের অজস্র প্রাণশক্তি প্রবাহিত হয়েছে—গভীরভাবে কিছু ভাবেননি এঁরা ভাবতে পারেননি, সেই সময়টা স্তবক গঠনে নূতনত্ব দেখিয়েছেন।

ক্রিশ্চিনা রসেটীর কবিতা যখন মোহিতলাল মজুমদার অনুবাদ করেছেন 'ভারতী'র পাতায় তখন তা কেবল মাত্র অনুবাদ হিসাবেই স্মরণযোগ্য নয়, তার মধ্যে প্রিব্যাফেলাইট কবিদের সঙ্গে মোহিত-লালের মনের বেশ একটা যোগ অনুভব করা যায়। তুলনীয়—

'আরবার যদি বসন্ত আসে আমার বনে
শুনিব না আমি যেই গান গায় রাতের পাখি ;
দিনের আলোয় গান গায় যারা ঝটিকা সনে।
তাহাদের সাথে উঠিব ডাকি।' ('যদি' : ক্রিশ্চিনা রসেটী)

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত মরিস, রসেটী, শঘনেসী প্রভৃতির কবিতা অনুবাদ করেছেন, তার দৃষ্টান্ত উদ্ধার করবার প্রয়োজন নেই, সেখানেও একই মানস সাদৃশ্য লক্ষিত হবে।

৭.

'ভারতী' পত্রিকায় এই সময় সত্যেন্দ্রনাথের পরই সবচেয়ে বেশী কবিতা লিখেছেন মোহিতলাল মজুমদার, যাঁর উদ্দেশে আধুনিক

কবি শ্রদ্ধা জানিয়ে লিখেছেন—'রবীন্দ্রনাথের বিরাট ব্যক্তিত্বের সর্বব্যাপী প্রভাব যখন অনতিক্রমণীয়, বিশালতায় না হোক বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে বাংলা সাহিত্যে দুচারটি প্রতিভার আশ্চর্য দীপ্তি তখনও আমরা দেখেছি। কবি মোহিতলাল এই বিশিষ্টদেব মধ্যেও বিশেষ একজন।'[১৫] আপাতদৃষ্টিতে 'ভারতী'-গোষ্ঠীর কবিদের সঙ্গে মোহিতলালের বৈসাদৃশ্যটাই চোখে পড়ে। দেহবাদী এবং দুঃখবাদী (শোপেনহাওয়ারপন্থী দুঃখবাদ) মোহিতলালের কবিতায় উগ্র কবিব্যক্তিত্বের প্রকাশ। সেই জন্যে তা আমাদের সহজেই চমকিত করে, বিস্মিত করে। কিন্তু একটু গভীরভাবে বিচার করলে দেখবো মোহিতলালের কবিতা 'ভারতী' পত্রিকায় একান্তই অবাঞ্ছিত ছিল না।

সত্যেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে সমালোচক মোহিতলালের গভীর অনুরাগের কথা বাদ দিলেও কবি মোহিতলালের কবি সত্যেন্দ্রনাথের প্রতি কবিতাটি ('সত্যেন্দ্রবিয়োগ') আমাদের মনে বিশেষভাবে দাগ কাটে। মোহিতলালের কবিতার ছন্দে, শব্দ ব্যবহারে এবং কয়েকটি কবিতার ভাববস্তুতে সত্যেন্দ্রনাথের একান্ত প্রভাব সেই সঙ্গে চোখে পড়বেই। (মোহিতলালেব 'বসন্ত আগমনী' 'মহামানব', 'আবির্ভাব' 'ইরাণী' 'ঘুঘুবডাক', 'বাদলরাতেব গান', 'পাপ' প্রভৃতি স্মবণীয়)। অন্যদিকে সত্যেন্দ্রনাথেব শেষের দিকেব কবিতায় ক্রমশঃ একটা পরিবর্তন দেখা দিচ্ছিল এবং হয়তো তাতে মোহিতলালের প্রভাব কার্যকরী হচ্ছিল। সত্যেন্দ্রনাথের পক্ষে জাতিভেদ প্রথার বিরোধিতা করা, গান্ধীজীর নেতৃত্ব স্বীকার প্রভৃতি স্বাভাবিক ছিল, কিন্তু রবীন্দ্রশিষ্য বিশ্বাসী-কবি সত্যেন্দ্রনাথ যখন সংশয় এবং অবিশ্বাস নিয়ে বিশ্বসৃষ্টি বিষয় প্রশ্ন করেছেন, তখনই বুঝি 'ভারতী'-গোষ্ঠীব কবিমানসেও পবিবর্তন দেখা দিয়েছে—

'কে জানে কেমন পবলোক, যাহে আকাশ রয়েছে ঢাকি।'
মূক মরি' সেথা পায় কি গো বাণী, অন্ধ কি পায় আঁখি?……

পুণ্যের ক্ষয়ে এই লোকালয়ে জন্ম কি হয় আর ?
কিবা সে পুণ্য ? কিবা সে পাতক ? মূল কোথা ছিল কার ?
সৃষ্টির সাথে কে সৃজিল মায়া ? কে দিল বৃত্তি যত ?
কে করিল হায় মনু সন্তানে স্বার্থসাধনে রত ?
তিমিরের পর তিমিরের স্তর দৃষ্টি নাহিক চলে
মৃত্যু সে কথা গুপ্ত রয়েছে। জীবিত কভু না বলে ;[১৬]

এই সঙ্গে সত্যেন্দ্রনাথ ক্রমে শিবের রুদ্ররূপের উপাসক হয়ে উঠছেন দেখতে পাই। (দ্রঃ 'জয়ধ্বনি' ঃ ভারতী—বৈশাখ ১৩২৫ ; 'বজ্রবোধন' ভারতী—শ্রাবণ ১৩২৫)। মোহিতলাল মজুমদার এবং যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের [১৭] কবিতায় রুদ্র-আরাধনা একান্ত প্রাধান্যলাভ করেছে, কিন্তু এর ইঙ্গিত ছিল সত্যেন্দ্রনাথ, এমন কি করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতায় পর্যন্ত।

ক। 'রুদ্ররূপে রোদন তুমি, সান্ত্বনা সে শান্ত শিবের রূপে,
জ্যোতিষ্ক হয় ফুৎকারে ছাই, পরম জ্যোতি জাগাত ধূলির স্তূপে
মৃত্যু-তালের নৃত্যে হৃদয় পড়েছে ঢলে চলতে তোমার সনে।
জাগাও প্রভু মুহ্যমানে, গতিক্রমের ক্রান্তি সংক্রমণে ;
রোদন মাঝে বাজুক বোধন বাঁশী'
তারার আখর রাখুক লিখে হিসাবহারা হিয়ার কান্না হাসি।'
(সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত)[১৮]

খ। 'কে এখানে পাঠিয়ে দিলে এই জাগরণ-মাঝ ?
মাথার পরে মেঘ-নগরে বজ্ররাগে ধ্রুপদ বাজে আজ।
পর্দা দিয়ে আড়াল করে'
লুকোচুরি খেলছে ওরে
সমঝ্‌তে পারিনে সেই মহাশিবের মহান অভিনয়,—
নিবল দিনের শেষ সোনালি, আমার দিনের আঁধার কিনারায়।'
(করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়)[১৯]

মোহিতলালের 'নারীস্তোত্রের' সুর ('স্বচ্ছন্দ-স্বৈরিণী ওযে, নিত্যশুদ্ধা—নহে সতী নহে সে অসতী') 'ভারতী'র অন্যান্য কবিদের মধ্যেও আমরা বারবার দেখেছি। হেমেন্দ্রকুমারের 'কাপালিকের উদ্বোধন'-এ মোহিতলাল মজুমদারের 'কালাপাহাড়' পূর্বাভাসিত।[২০] অনুরূপ-

ভাবে কুমুদরঞ্জন মল্লিকের 'অঘোরপন্থী' কবিতাতে মোহিতলালের 'অঘোরপন্থী' কবিতার সুর একান্ত সোচ্চার।

সত্যেন্দ্রনাথের কবিতা যদিও সাধারণ দৃষ্টিতে একান্ত প্রাচীনপন্থী, এবং কিছুটা কৃত্রিম, কিন্তু সেই সঙ্গে স্বীকার করতে হবে যে 'ভারতী'-গোষ্ঠীর কুলপ্রদীপ সত্যেন্দ্রনাথের কবিতাতেই আধুনিক যুগের স্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায়। প্রমথ চৌধুরীর 'সনেট পঞ্চাশৎ' কাব্যগ্রন্থটি সমালোচনা করার সময় সত্যেন্দ্রনাথ যে ভাবে তার রসাস্বাদ করেছিলেন তা থেকেই তাঁর তরুণ বুদ্ধিদীপ্ত মনের পরিচয় পাই—'সনেট পঞ্চাশৎ পদে পদে আমাদিগকে চমৎকৃত করে, আমাদের চিত্তবৃত্তিকে উদ্বোধিত করে, চিন্তা শক্তিকে উদ্দীপিত-উত্তেজিত-এমনকি প্রকুপিত করিয়া তোলে বলিলেও ভুল হইবে না। অন্তঃকরণের মধ্যে জীবনের ও জাগরণের সাড়া পড়িয়া যায়। এগুলিকে লইয়া খুসী হইতে পারা যায়, ঝগড়া করিতে পারা যায়, আর রসান্বেষী রসিক হইলে ইহার দ্বৈত ভাবের দ্বন্দ্বের মধ্যে জীবনের ছন্দ আবিষ্কার করিয়া আনন্দিত হইতে পারা যায়।'[২১] সত্যেন্দ্রনাথের 'চম্পা' কবিতাটি এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে স্মরণীয়—শুধু বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে নয়, অলংকার এবং চিত্রকল্পের দিক দিয়ে সেটি আধুনিক কবি-মনেরই সৃষ্টি। 'উগ্রমদ্য সম রৌদ্র'—এ উপমা রবীন্দ্রকাব্যে কদাচ পাবো না; পাবো জীবনানন্দ দাশের কবিতায়—'পর্দায় গালিচায় রক্তাভরৌদ্রের বিচ্ছুরিত স্বেদ। রক্তিম-গেলাসে তরমুজ মদ।' 'ভারতী'-গোষ্ঠীর কবিরা সব সময়েই আজকের দিনে আমাদের নিরাশ করেন, এমন বললে মিথ্যে বলা হবে; তাঁদের কবিতা কখনো আমাদের মনে স্নিগ্ধ প্রফুল্লতা জাগায়, কখনো ঐতিহাসিক-স্মৃতি উদ্দীপিত করে, কিন্তু কোনো কোনো বিরলমুহূর্তে ভালো কবিতা হিসাবেই তা আমাদের ভালো লাগে।

১। 'ভারতী বয়সে প্রাচীন হইতে চলিয়াছে বটে কিন্তু ইহার অন্তরে কখনো প্রাচীনতার ছোপ পড়ে নাই। চিরদিনই ভারতী সময়ের সঙ্গে তালে তালে পা রাখিয়া চলিয়াছে, কখনো পিছনকে আঁকড়াইয়া পড়িয়া থাকে নাই।

কাজেই সে চির নবীন।...বঙ্গ সাহিত্যের গতির ইতিহাস ইহার সহিত জড়িত। এই সাহিত্যের ভয়, আশা, উদ্বেগ, উচ্ছ্বাস, চিন্তা কর্ম, স্বপ্ন—এ সমস্তেরই ঢেউ ইহার বুকের উপব দিয়া খেলিয়া গিয়াছে।' ('ভারতীর ইতিহাস'—হেমেন্দ্রকুমার রায়। 'ভারতী'. বৈশাখ ১৩২৩)।

২। '১৩২৬ সালে বন্ধুরা মিলিয়া এক সভা গড়েন,—সত্যেন্দ্র তার নাম রাখিলেন রবীন্দ্র-মণ্ডলী। সত্যেন্দ্র তাহার প্রধান উদ্যোগী। এ সভা খাতার পিঠে চড়িযা কোনদিন জাঁকাইয়া বসিবার চেষ্টা করে নাই। প্রতি রবিবাবে অপরাহ্নে একজনেব গৃহে বন্ধুদের চায়ের মজলিশ বসিত, আর অতিথিদের আপ্যায়নের জন্য আমন্ত্রণকারী নূতন রচনা পড়িয়া শুনাইতেন। সত্যেন্দ্র এ সভার প্রথম উদ্বোধন করেন।' ('সত্যেন্দ্র স্মরণে' : সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়। 'ভারতী', শ্রাবণ ১৩২৯)।

এই প্রসঙ্গে আরও তথ্যের জন্য দ্রষ্টব্য, 'মণিলালের আসর' : হেমেন্দ্রকুমার রায় ('মানসী ও মর্মবাণী', বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৬)।

৩। 'প্রবাসীব বৈঠক ছাড়াও তখন কলিকাতার দুইপ্রান্তে দুইটি প্রবল সাহিত্য-বৈঠক বসিত। একটি 'মানসী'র, দ্বিতীযটি 'ভারতী'র। মানসীর সম্পাদক মণ্ডলী ফকিরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সুবোধচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও বর্তমান লেখক।...কবিবন্ধু সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, করুণানিধান, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ও কালিদাস রায়ও তখন আমাদের পত্রিকার লেখক। তাঁহাবাও মাঝে মাঝে আসিতেন। (রবীন্দ্রনাথ ও যুগসাহিত্য : যতীন্দ্রমোহন বাগচী। পৃঃ ৩১)।

৪। 'ভারতী'-গোষ্ঠীর লেখকদের আক্রমণ করে সে যুগে যে সব ব্যঙ্গ কবিতা লেখা হতো, তার সাহিত্যিক মূল্য কিছু না থাকলেও তাতে এঁদের বিরুদ্ধে যে অভিযোগগুলি করা হয়েছে তা থেকেই এঁদের নিজেদের মধ্যে যে সাধর্ম্যেব লক্ষণগুলি ছিল তা জানা যাবে—

'যা লিখিবি তাই হইবে পদ্য ,
ছত্র ছাড়িলে গদ্য
তর্জমা কবি হইবি মোপাসাঁ --
চুবিটি করিবে মন্দ।
রাজ দরবারে লভিবি তখমা
পাবি প্রশংসাপত্র
দলে এলে রোজ খাবি দুধভাতী
সন্দেহ নাহি তত্র।
নাটক লিখিবি আটক করে কে ?
রচিবি যা, তাই গল্প।
হিজিবিজি টানি, রচিবি রূপক,—
ব্রহ্মা বুঝিবে স্বল্প।
টপ্পা গাহিবি, হবে ব্রহ্ম-বেদ—
টোল সে বধূব তল্প।
আদিরসে ভক্তি উছলি উঠিবে—
ডুবিবে কল্প কল্প।
এ-ওর ভক্ত সমাজে তোদের
করিয়া লইব ভর্তি—
কায ফতে করি তাড়াব না আর, –
কামের শপথ—সত্যি !'

৫। 'এই কবিগোষ্ঠীর মধ্যে মননগত একটি গভীর ঐক্য বিশ শতকের উত্তরার্ধে, বিশেষ করে আজকের দিনে নিশ্চিত ভাবে চোখে পড়ে। কবিতার প্রতি নিষ্ঠা বোধ—কাব্য-কলার প্রতি গভীর শ্রদ্ধানুভূতি—রবীন্দ্রনাথের রীতি সম্পর্কে প্রভূত প্রীতি ও সম্ভ্রম এবং সর্বোপরি ভোগস্পৃহার ইতস্ততঃ স্ফুরণ সত্ত্বেও—পারমার্থিকতার প্রতি অতি ধ্রুব এক আকর্ষণ এঁদের কাব্য সৃষ্টির মৌল প্রেরণা বৈচিত্র্যের মধ্যে নিশ্চিত রূপে বিদ্যমান।' (কিরণধন-চট্টোপাধ্যায়ের 'নতুন খাতা ও অন্যান্য কবিতা'। ভূমিকা: ডঃ হরপ্রসাদ মিত্র)।

৬। 'কলিকাতায় স্থায়িভাবে বসবাসের আগে সেই যে একসময়ে জীবনের দীর্ঘকাল পল্লীবঙ্গে কাটাইয়াছিলেন সেই স্মৃতি মানস-প্রতিমা গড়িতে তাঁহাদের প্রভূততম সাহায্য করিয়াছে। করুণানিধান ও যতীন্দ্রমোহন মনে মনে পল্লীবাসী ছিলেন। কালিদাস রায় এখনও আছেন। কুমুদরঞ্জন তো কায়মনোবাক্যে এখনো পল্লীবাস করিতেছেন।'—প্রমথনাথ বিশী ('বাংলা কবিতা: ১৯০১-২৫।' 'দেশ' সাহিত্য-সংখ্যা, ১৩৬৪)।

৭। সাহিত্য-বিতান: মোহিতলাল মজুমদার।

৮। 'কুমুদরঞ্জন মল্লিকের শ্রেষ্ঠ কবিতা'। পরিচায়িকা: কালিদাস রায়।

৯। দ্রঃ—অজিতকুমার চক্রবর্তী লিখিত দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগ্‌চীর 'একতারা' কাব্যগ্রন্থের দীর্ঘ এবং রসজ্ঞ সমালোচনা। 'ভারতী', আশ্বিন ১৩২৪।

১০। ভারতী ১৩১৭।

১১। 'বর্ষার কথা'—সবুজপত্র। আষাঢ় ১৩২১।

১২। সাহিত্য। বৈশাখ ১৩১৯।

১৩। প্রির‍্যাফেলাইট কবিগোষ্ঠীর অন্যতম নেতা উইলিয়ম মরিসের একটি বিখ্যাত কবিতা এই প্রসঙ্গে স্মরণ করিতে পারি—

Forget six countries overhung with smoke,
Forget the snorting steam and piston stroke,
Forget the spreading of the hideous town ;
Think rather of the pack house on the down,
And dream of London, small, and white and clean,
The clear Thames bordered by its gardens green !
('The Earthly Paradise.')

১৪। "The aestheticism of Rossetti and Burne-Jones is not a creed of 'Art's for Art's sake'; though in some ways they anticipate the 1890's; rather is it a spirited reassertion of those principles of colour, beauty, love and cleanness that the drab, agitated, discouraging world of the mid-nineteenth century needed so much. It is more accurately defined as a protest against existing conditions than as an escape from them, a protest none the less sincere for the preference of some, of its exponents for a world of aesthetic imagination." —Dr. D. S. R. Welland: Pre-Raphaelites in Literature and Arts. (London 1953).

১৫। 'মোহিতলাল মজুমদারের সুনির্বাচিত কবিতা' (ভূমিকা: প্রেমেন্দ্র মিত্র)।

১৬। সাম্য: সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

১৭। যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত যদিও এই সময় কবিতা লিখতেন, মণিলালের সম্পাদনাকালে 'ভারতী'তে তাঁর একটিও কবিতা প্রকাশ হতে দেখি না। এবং মানস ধর্মের দিক দিয়েও 'ভারতী'-গোষ্ঠীর কবিদের সঙ্গে তাঁর খুব যোগ বোধ হয় ছিল না, তাই বর্তমান প্রসঙ্গে তাঁর সম্বন্ধে কোনো অলোচনা করা হয়নি।

১৮। ভারতী। চৈত্র ১৩২৬।

১৯। ভারতী। কার্তিক ১৩২৫।

২০। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (চতুর্থ খণ্ড): সুকুমার সেন। পৃঃ ১৬২।

২১। ভারতী। শ্রাবণ ১৩২০।



রবীন্দ্র প্রভাব ও স্বকীয়তা

স্বীকার করাই ভালো, যতীন্দ্রমোহন বাগ্‌চী একজন বড় কবি নন। প্রত্যেক যুগেই বড় কবি ছাড়াও একাধিক ছোট কবি থাকেন। স্বতন্ত্রভাবে দেশের কাব্য-আন্দোলনে এঁদের দান সামান্য। কিন্তু যৌথভাবে এঁরাই যুগের কাব্যধারাকে পরিণতির পথে এগিয়ে নিয়ে যান। একজন কবির লেখা সব কবিতাই যেমন বিরাট কীর্তি হয়ে ওঠে না, তেমনি একটি যুগেও সব কবিই বড় কবি হতে পারেন না এবং অনেকগুলি কবিতার মধ্য দিয়ে একজন কবির ব্যক্তিত্ব যেমন স্পষ্ট হয়ে ওঠে, তেমনি এই অনেক ছোট কবির সমবেত চেষ্টাতেই একটি যুগ তার স্বকীয় কাব্য-লক্ষণ লাভ করে। অন্যদিকে ইতিহাসের ধারাবাহিকতা রক্ষাতেও এই ছোট কবিদের দান বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। ভালো-মন্দ-মাঝারি অনেক কবির যুগব্যাপী পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলেই কবিতার অগ্রগতি। এঁদের মধ্যে কেউ ছন্দের চর্চা করলেন, কেউ অলঙ্কার ব্যবহারে নৈপুণ্য দেখালেন, কেউ ভাষাকে কালোচিত পরিবর্তিত করলেন কেউ কল্পনায় নূতন দিগন্তের আভাস দিলেন। এমনি করেই কবিতার ইতিহাসে নূতন যুগের সূচনা হয়।

যতীন্দ্রমোহন বাগ্‌চী বড় কবি নন একথা সত্য। কিন্তু তিনি কবি, একথাই আরো বড় সত্য। 'সকলেই কবি নয়। কেউ কেউ কবি; কবি— কেননা তাদের হৃদয়ে কল্পনার এবং কল্পনার ভিতরে চিন্তা ও অভিজ্ঞতার স্বতন্ত্র সারবত্তা রয়েছে এবং তাদের পশ্চাতে অনেক বিগত শতাব্দী ধরে এবং তাদের সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক জগতের নব নব কাব্য-বিকীরণ তাদের সাহায্য করছে। সাহায্য করছে; কিন্তু সকলকে সাহায্য করতে পারে না; যাদের হৃদয়ে কল্পনা ও কল্পনার ভিতরে অভিজ্ঞতা ও চিন্তার সারবত্তা রয়েছে তারাই সাহায্যপ্রাপ্ত হয়'।[১] যতীন্দ্রমোহন ঐতিহ্যকে ধারণ করেছেন এবং ঐতিহ্যকে পুষ্ট করেছেন। সেই সঙ্গে কল্পনার

সমুন্নতি, আবেগের স্বতঃস্ফূর্ততা এবং স্বাভাবিক সৌন্দর্যদৃষ্টি তাঁর মধ্যে লক্ষিত হয়েছে।

তবে যতীন্দ্রমোহন তাঁর নিজের যুগেও কিছুটা অস্পষ্ট কবি-ব্যক্তিত্বের অধিকারী। তাঁর সমকালীন কবিদের মধ্যে অন্যদের যেমন খুব সহজেই বিশিষ্ট একটি বিষয়-প্রবণতার অনুসরণে চিহ্নিত করা সম্ভব, যতীন্দ্রমোহনকে তা করা যায় না। কুমুদরঞ্জন 'ভক্ত কবি' কিংবা 'খাঁটি বাঙালী কবি', যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত 'দুঃখবাদী কবি', কাজী নজরুল 'বিদ্রোহী কবি'। এক হিসেবে এঁদের কৌতূহল, মানসিকতা এবং কাব্য-সামগ্রী অনেক পরিমাণে একমুখী। যতীন্দ্রমোহনের কবিতা শতধারায় প্রবাহিত হয়েছে ; বিষয় নির্বাচনে তাঁর মনের প্রসার প্রমাণিত হয়। অডেন-গ্যারেটের মত তিনিও বলতে পারেন, কবিতার বিষয় কি না হতে পারে? 'Birth, death, the Beatific Vision, the abysses of hatred and fear, the awards and miseries of desire, the unjust walking the earth and the just scratching miserably for food like hens, triumph earthquakes, deserts of boredom and featureless anxiety, the Golden Age promised of irrevocably past.'[2]

অবশ্য এর দ্বারা আধুনিক যুগের কাব্যধারার সঙ্গে যতীন্দ্র-মোহনের যোগাযোগ প্রমাণিত হয় না। উনবিংশ শতাব্দীর সেই প্রথম যুগেও ঈশ্বর গুপ্তের কবিতায় একধরণের বহুমুখিতা লক্ষ্য করেছি। হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্রের খণ্ড কবিতার মধ্যেও বিষয়ের কোনো সীমারেখা রক্ষিত হয় নি। অন্যদিকে বিহারীলালের কবিতায় কল্পনার অবাধ বিস্তার সত্ত্বেও বিষয়ের সামান্যতা চোখে পড়ে। আসলে দু'ধরণের কবি আছেন, কেউ বিষয়মগ্ন, কেউ আত্মমগ্ন। ইংরেজী কাব্য সাহিত্যে সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমদিকে বিষয়কে প্রধান্য দেওয়া হয়েছে ; আবার অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ থেকে রোমান্টিক কবিরা হৃদয়ের সংবাদকেই কাব্যের একমাত্র আধেয় বিবেচনা করেছেন। হৃদয়ের সংবাদেও বৈচিত্র্য থাকতে

পারে, কিন্তু সেখানে কবিমনের সমগ্রতা ও নির্বাচনী প্রবৃত্তি বিষয়ের ক্ষেত্রকে সঙ্কুচিত করে। বাংলা দেশেও উনবিংশ শতাব্দীর খণ্ড-কবিতা বিষয়মগ্ন ; আত্মমগ্নতার সূচনা বিহারীলাল থেকে। রবীন্দ্রনাথ অবশ্যই সকল সীমার অতীত ; তবু রোমান্টিক কবির মতই সাময়িক ঘটনা তাঁর খুব কম কবিতারই বিষয়।

বিংশ শতাব্দী থেকে হাওয়া বদল হল। এলিঅটের মনে হলো পোপ-ড্রাইডেনের প্রতি এতদিন আমরা অবিচার করে এসেছি ; অডেন-গ্যারেটের উক্তি তো পূর্বেই উদ্ধৃত হয়েছে। ইংরেজী সাহিত্যে এই বিষয়মুখিতা অবশ্য প্রতিক্রিয়াবশতঃ তীব্রতা লাভ করেছে। আমাদের দেশে রবীন্দ্র-কাব্য-ঐতিহ্য কোনদিনই সুপ্রতিষ্ঠিত হয় নি। বাইরে আমরা রবীন্দ্রনাথকে কবিগুরু বলেছি, অন্তরে ঈশ্বর গুপ্ত-হেমচন্দ্রের প্রতি সহজ অনুরাগ অনুভব করেছি। আসলে বাংলাদেশে কাব্যসংস্কার বহুদিন থেকেই বিষয়মুখী।

উনবিংশ শতাব্দীর অধিকাংশ বাঙালী কবিই একটা বাইরের প্রেরণার উপর নির্ভর করে কবিতা লিখেছেন ; এই অর্থে তাঁদের অধিকাংশ কবিতাই সাময়িক কবিতা। তার মানে অবশ্যই এ নয় যে, সামাজিক বা রাজনৈতিক কোনো আঘাতের প্রতিক্রিয়া ছাড়া তাঁরা কবিতা লিখতেন না—আসল কথা, উপলক্ষ্য ছিল কাব্যরচনার পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়। সেইজন্য শোক-কাব্য লিখতেন মৃত্যুকে নিয়ে ; বিবাহ বা উৎসবকে স্মরণ করে আনন্দগাথা লিখতেন ; কবিতার মধ্য দিয়ে নিজের সমাজসত্তাকে প্রকাশ করতেন। বাংলা কবিতা অভিজ্ঞতাবাহী বলেই চতুর্দিকের জগৎ ও জীবন কাব্যের আশ্রয় হয়েছে ; তাঁদের কবিতাও দেশকালের খণ্ডসীমায় চিহ্নিত।

অবশ্য অতি-আধুনিক কাব্যান্দোলনেও অভিজ্ঞতার সাক্ষ্যকে প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে। সমাজ-চেতনা ও বাস্তবানুরাগ গত শতাব্দীর মতই বর্তমান শতাব্দীতে আবার কাব্য-সাহিত্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে যুক্ত হচ্ছে। একে তাই আধুনিকতা না বলে কবি-মানসিকতা বলাইভালো।

রবীন্দ্রনাথ বোধহয় প্রথমে ঠাট্টাচ্ছলেই 'আত্মজৈবনিক' শব্দটি ব্যবহার করেন, কারণ তাঁর ঘোরতর আপত্তি ছিল তাঁর কাব্যকে ঐ নামে অভিহিত করায়। আসলে রবীন্দ্রনাথের কবিতা স্বানুভাবাত্ম হয়েও আত্মজৈবনিক নয়। তাঁর শেষের দিকের কয়েকটি কবিতায় স্মৃতিচারণ প্রধান হলেও সমগ্রত তাঁর কবিতায় ব্যক্তিজীবনের ইতিহাস চোখে পড়ার মতই কম। অবশ্য রবীন্দ্রনাথের কবিব্যক্তিত্বের সৌন্দর্যস্পৃহা, অসীমের প্রতি আকর্ষণ, ঔপনিষদিক ভক্তি, প্রকৃতি চেতনা, বিরহ প্রধান-প্রেমভাবনা ইত্যাদি বিচিত্র অনুভূতির প্রকাশ তাঁর কবিতায় অলক্ষ্য নয়। কিন্তু সব কিছুর মধ্য দিয়ে দেশ ও কালের দ্বারা চিহ্নিত, সমাজ ও পরিবারের গণ্ডীতে আবদ্ধ একটি ব্যক্তি বিশেষকে আবিষ্কার করা যায় না। এমন কি তাঁর মুদ্রিত অধিকাংশ পত্রাবলীতে পর্যন্ত বিশেষ অভিজ্ঞতাকে নির্বিশেষত্ব দানের আত্যন্তিক প্রয়াস সর্বদা লক্ষণীয়। কখনো কখনো এই প্রয়াস প্রায় কৃত্রিমতার ধার ঘেঁসে গেছে—এবং যদি না অতুলনীয় বাক্‌বিভূতি তাঁর স্বভাবসিদ্ধ হতো, তাহলে তাঁর তত্ত্বানুশীলন অনেক সময়েই পাঠক মনে অনীহা সৃষ্টিতে সাহায্য করতো। বলাবাহুল্য 'আমারই চেতনার রঙে পান্না হল সবুজ'—কবিতা হিসাবে অসাধারণ; কিন্তু এ অভিজ্ঞতা দেশকালের দ্বারা আবদ্ধ, ব্যক্তি পরিচয়ের আধারে পরি-বেশিত নয়।

তবে রবীন্দ্রনাথের পক্ষে যা সহজ এবং স্বাভাবিক, অন্য কবির পক্ষে তা শুধু দুরূহ-সাধ্য নয়, অনেক সময়েই অসম্ভব। অবশ্য এখানেও সেই কবি-মানসিকতার প্রশ্ন ওঠে। 'ভারতী' যুগের কবিরা রবীন্দ্রনাথের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন, কিন্তু অনেক সময়েই সন্দেহ জাগে যে, এ প্রভাব একান্ত বহিরঙ্গ নির্ভর। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, কিরণধন চট্টোপাধ্যায়, করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়,—এঁদের কবিতার প্রেরণা কি ছিল? এঁদের কবিতার অবলম্বন কি ছিল? কখনো লঘু কল্পনার উন্মত্ত পক্ষবিস্তার, কখনো সমাজ সমস্যা ও রাজনীতি

চেতনার প্রত্যক্ষ প্রকাশ, কখনো ব্যক্তিজীবনের অভিজ্ঞতা সূত্রে পল্লী বাংলার অন্তরঙ্গ রূপচিত্রাঙ্কন। মূলতঃ এবং মুখ্যতঃ এঁরা বিষয়মগ্ন কবি; কিন্তু রবীন্দ্রযুগে কাব্যরচনায় রত বলেই আত্মমগ্নতাকে অস্বীকাব করতে পাবেন নি। 'ভারতী'যুগের কবিরা এই 'তিক্তদ্বিধায় সীমাবদ্ধ' বলে তাঁদের শক্তি যতখানি, ততখানি প্রকাশ-ক্ষমতা লাভ কবেন নি; এই কবিদেব বচনা এমন 'সমতল রকম সদৃশ' হওয়ার কারণ একান্ত রবীন্দ্রপ্রভাবই নয়; এঁরা নিজেদের শক্তিকে অনুভব কবেননি বলেই বা প্রত্যক্ষ কববাব সুযোগ পাননি বলেই এঁদেব কবিতা বহিরঙ্গ বা অন্তরঙ্গ কোনো একটি পরিচয় নিয়ে স্পষ্টরেখ হয়ে উঠলো না। রবীন্দ্রযুগে জন্মেছেন বলেই এই ব্যর্থতা তাঁদের অনিবার্য ললাট-লিপি।

২.

যতীন্দ্রমোহন 'ভারতী' যুগের কবি। 'ভারতী' পত্রিকায় তিনি যে শুধু প্রায়ই লিখতেন তাই নয়, 'ভারতী'-গোষ্ঠীর কবিদের সঙ্গে তিনি অন্তরঙ্গ ভাববন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন। কুমুদরঞ্জন মল্লিক বা করুণা-নিধান বন্দ্যোপাধ্যায়ও 'ভারতী' পত্রিকার লেখক ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁদের পল্লী-প্রীতি এবং ঐতিহ্যানুসরণ সে যুগের তরুণ কবিদের সঙ্গে তাঁদের মানসদূরত্ব নির্দেশ করে। প্রকৃতপক্ষে সত্যেন্দ্রনাথ দত্তই ছিলেন এ যুগের প্রধান কবি, যিনি রবীন্দ্রানুরাগী হয়েও কিছু স্বাতন্ত্র্য দেখিয়েছেন। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত যতীন্দ্রমোহনের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন (বয়সের দিক দিয়ে যতীন্দ্রমোহন সত্যেন্দ্রনাথের থেকে চার বছরের বড়ো)। সত্যেন্দ্রনাথের প্রভাব সে যুগের সকল কবিদের উপর পড়েছিল এবং এই প্রভাবের সার্থক রূপ দেখি কিরণধন চট্টোপাধ্যায় ও যতীন্দ্রমোহন বাগ্‌চীর কবিতায়। যতীন্দ্রমোহন তীব্র সৌন্দর্য-পিপাসা, মানবচেতনা, এবং শিল্প-দক্ষতায়—সবদিক থেকেই তিনি এ যুগের একজন বিশিষ্ট কবি; এবং তাঁহার রবীন্দ্রানুরাগ সে যুগের

পক্ষেও উল্লেখযোগ্য ছিল। যতীন্দ্রমোহন 'রবীন্দ্রনাথ ও যুগসাহিত্য' গ্রন্থে এই যুগের একটি চিত্র এঁকেছেন—

"যে 'সাধনা'র যুগে কবির গদ্যে, পদ্যে, ছোটগল্পে ও বিচিত্র রস-রচনার অপর্যাপ্ত সম্ভারে তাঁর প্রতি অপার শ্রদ্ধায় আমার সাহিত্যিক চিত্ত উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছিল, এই সময়ে সেই 'সাধনা'র সহসা অকাল মৃত্যুতে হৃদয়ে অতিশয় আঘাত লাগিয়াছিল। 'প্রবাসী', 'প্রদীপ' 'ভারতী' প্রভৃতি পত্রিকায় কবির অজস্র রচনা প্রকাশিত হইলেও সে ক্ষোভ মিটে নাই। সহসা কবি-সম্পাদিত নবপর্যায় 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশের সংবাদে নূতন আশায় পুনরায় হৃদয় যেন ভরিয়া উঠিল। এই সময় কবি-মন্দিরে যাতায়াত উপলক্ষে তাঁহার সহিত পত্র-ব্যবহারে এবং 'বঙ্গদর্শনে' আমার রচনা প্রকাশ সূত্রে আমি ক্রমশঃ কবির অন্তর-সান্নিধ্যের সৌভাগ্য লাভ করিলাম এবং সেই অধিকারে দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগ্‌চী দাদা-মহাশয়কে ও সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত প্রমুখ কয়েকজন সাহিত্য-সুহৃদ্‌কেও কবির সহিত পরিচিত করিয়া দিলাম।

"যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন পর্যন্ত রবির আলোকে বঙ্গীয় সাহিত্য সমাজ উদ্ভাসিত হইয়া উঠে নাই। সমাজের শিখর দেশে আলোকের প্রথম স্পর্শ লাগিয়াছিল মাত্র; শিক্ষিত-সাধারণের নিম্নস্তরে রবিরশ্মি প্রবেশ করিতে পারে নাই। কিন্তু ক্ষেত্র বিস্তৃত না হইলেও অত্যল্পসংখ্যক রসোপভোক্তার বিচারে রবীন্দ্রসাহিত্য পরম উপভোগ্য হইয়া উঠিয়াছিল।

"ফলে ধীরে ধীরে যেন দুইটি পৃথক দল গড়িয়া উঠিতে লাগিল। একদল, যাঁহারা সংখ্যায় বৃহৎ, বলিতে লাগিলেন,—রবীন্দ্রনাথের আদর্শ বিদেশী; প্রকাশের ভাষা খাঁটি বাঙ্গালা নয়। উৎকৃষ্ট পাশ্চাত্ত্য ভাবের সহিত দেশীয় বৈষ্ণব সাহিত্যের ধার করা মালমসলা মিলাইয়া তিনি যে অদ্ভুত খেচরান্ন প্রস্তুত করিতেন, তাহা সুধীজনের সেব্য নহে, পরন্তু তাহাতে বাঙ্গালা ভাষা উৎসন্ন যাইবে। 'বঙ্গবাসী', 'হিতবাদী' প্রভৃতি তদানীন্তন বড় বড় পত্রিকা হইতে কবির প্রতি নানা

অসম্মানসূচক মন্তব্য এবং মুরুব্বিয়ানার উপদেশ বর্ষিত হইতে লাগিল। কেহ কেহ বলিলেন কাব্যবিশারদের 'মিঠেকড়া'ই উহার উপযুক্ত সমালোচনা।

"ইতিপূর্বে Higher Training for Yougmen Hall-এ কবি যখন তাঁহার অপূর্ব কাব্যনাটিকা 'গান্ধারীর আবেদন' আবৃত্তি করিয়াছিলেন, তখন জগদীশ বসু (পরে স্যার), রামেন্দ্রসুন্দর প্রভৃতি বহু বৈজ্ঞানিক ও সাহিত্যিক মহামনস্বীদিগের চক্ষে একদিকে যেমন অশ্রুধারা গড়াইয়া পড়িতে দেখিয়াছি, অন্যদিকে 'মহাভারতের পুণ্যকথা লইয়া আবার কি নূতন ঢঙের কাব্য' বলিয়া দু এক-জনকে সভাগৃহ হইতে উঠিয়া যাইতেও দেখিয়াছি, এবং খ্যাতনামা ব্যক্তি বিশেষের রচনা হইতে 'যত মুদীমালা বাংলা পড়ে রবিঠাকুর লেখে' প্রভৃতি মন্তব্য উদ্ধার করিতেও শুনিয়াছি।.........

"রবীন্দ্রনাথের কলিকাতা বাসকালে আমি মধ্যে মধ্যে কবি গৃহে যাতায়াত করিতাম এবং তাঁহার কল্পনা, মন্তব্য, রচনা ও সাহিত্য বৈঠকের যে সকল সংবাদ সংগ্রহ করিয়া আনিতাম, বন্ধুদলের মধ্যে তাহা লইয়া উৎসাহ ও চাঞ্চল্যের সঞ্চার হইত।........

"ঐ সকল দিনে আমার প্রতি কবির যে স্নেহ-প্রীতির পরিচয় আমি পাইয়াছিলাম, তাহার মধুস্বাদ আজ পর্যন্ত আমার মনের বসনায় সুমধুর স্মৃতিরূপে বিরাজ করিতেছে।"[৩]

যতীন্দ্রমোহন যখন কবিতা লেখা সুরু করেন, যুগগত এবং ব্যক্তিগত উভয় কারণেই রবীন্দ্রনাথের কবিতা তাঁর আদর্শ ছিল। 'অর্থাৎ তাঁদের পক্ষে অনিবার্য ছিল রবীন্দ্রনাথের অনুসরণ এবং অসম্ভব ছিল ববীন্দ্রনাথের অনুকরণ'।[৪] যতীন্দ্রমোহনের প্রথম কাব্য-গ্রন্থ 'লেখা' (১৯০২) রবীন্দ্রনাথ সংশোধন করে দিয়েছিলেন—সেকথা আগেই বলেছি। যতীন্দ্রমোহনের কবি মনে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব সেই প্রথম যুগ থেকেই গেঁথে গিয়েছিল। যতীন্দ্রমোহন,—কুমুদরঞ্জন বা করুণানিধানের মত ভক্ত ছিলেন না; কালিদাস রায়ের মত নৈতিক

আদর্শ বা তত্ত্বমুখিতাও তাঁর মধ্যে দেখি না ; সত্যেন্দ্রনাথের মতই তিনি 'কবিতার জন্য কবিতা' মতবাদে বিশ্বাস করতেন। অবশ্যই ভক্তির অভাব নাস্তিকতার সূচনা করে নি। রবীন্দ্রনাথের 'প্রাচীন ভারতে মানস ভ্রমণের যুগে' যতীন্দ্রমোহন কবিতা লেখা সুরু করলেও প্রথম থেকেই তাঁর কবিতায় একই সঙ্গে সৌন্দর্যাভিসার ও মানব-মুখিতা লক্ষিত হয়েছে। গীতাঞ্জলি-গীতিমাল্য তাঁকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে নি। রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে তিনি পেয়েছেন (সে যুগের অধিকাংশ কবিই পেয়েছেন) 'জীবন এবং জগৎ সম্বন্ধে অস্তিবাচক প্রত্যয়ের সমর্থন[৫] ; প্রবল আদর্শবাদ (প্রেমের কবিতায় লক্ষণীয়) ; এবং কবিতার সচেতন-রূপকর্মে নিষ্ঠা। পুরাণের নবজন্ম ঘটানোর ক্ষেত্রেও রবীন্দ্র-নাথের 'কাহিনী' যতীন্দ্রমোহনকে প্রেরণা দিয়েছিল সন্দেহ নেই।

'ভারতী' পত্রিকার কবিরা কি ভাবে রবীন্দ্রনাথকে অনুসরণ করে ছিলেন তার কিছু দৃষ্টান্ত পূর্ব পরিচ্ছেদে দেওয়া হয়েছে। যতীন্দ্র-মোহনের কয়েকটি কবিতাও এই প্রসঙ্গে উদ্ধৃত করা যেতে পারে :

১। 'আমার প্রিয়ার নয়ন নহেক
হরিণীর চেয়ে ভালো,
আঁখি তারা তার কালো বটে, নয়
ভ্রমরীর চেয়ে কালো।
চঞ্চল আঁখি—ইঙ্গিতে কভু
খঞ্জন নাহি নাচে,
বেণীর তুলনা শুনিয়া নাগিনী
লাজে না লুকায়ে বাঁচে......'ইত্যাদি (প্রিয়া)

[তুলনীয়—রবীন্দ্রনাথের 'ক্ষণিকা' কাব্য]।

২। ভৃত্য। জয় হোক—
দেবী। থাক্—আর কাজ নাই জয়ে,
কাজ নাই স্তুতি মুগ্ধ মধুর বিনয়ে ;
বৃথা বাক্যে নাহি ফল, শুন অতঃপর—
কার্য হতে ভৃত্য তুমি লহ অবসর।

ভৃত্য। অন্তরে বহিয়া তীব্র অপরাধ রাশি
হে দেবি, চরণপ্রান্তে দাঁড়াইনু আসি'
কোনও ভিক্ষা নাই আজ ; সব লজ্জা ভুলি'
দুর্বলতা আজি মোর দহিছে হৃদয়—...ইত্যাদি (ক্ষমা) ;
[তুলনীয়—রবীন্দ্রনাথের 'আবেদন']।

৩। মাগো, তোমার আজকে নাকি চুল বাঁধার 'একজামিন'—
আরশি নিয়ে আছ বসে' সেই হতে সারাদিন।
চুল বাঁধা—সে পরে হবে, কাপড় দে বার করে,
বাবার সঙ্গে বেরোব আজ ভাল কাপড় পরে'।... ইত্যাদি (পাগুা)

অথবা,

বাবা নাকি—যাবেন চলে আবার ?
কলকাতাতে কি আছে মা বাবার—
সেখানে যান কেন ?
লুকিয়ে থাকব এমনি খাটের তলে
বাবা যখন ডাক্‌বে 'ভুলো' বলে—
দিস্‌নে বলে যেন।
খুঁজতে যখন রাত্তির হয়ে যাবে—
ঘাটে তখন নৌকো কোথায় পাবে। (অভিমান)
[তুলনীয়—রবীন্দ্রনাথের 'শিশু' কাব্য]।

৪। চাহ না কাহারো পানে, দিক হতে দিগন্তরে শুধু
দুর্নিবার বারিরাশি নিরন্তর বহিতেছে ধূ ধূ—
মৃত্যুময় মহামরু—নাহি তল নাহিক কিনারা,
হীনবল যাত্রীদলে পলকে করিয়া দিশাহারা।
ফেনিল উচ্ছল মৃত্যু গর্জিয়া আসিছে চারিধারে,
মগ্ন করি দিগ্‌দেশ, সমাচ্ছন্ন প্রলয়-আঁধারে,
আশাহীন আর্তকণ্ঠে ভয়ে জীব ডাকে—ত্রাহি ত্রাহি—
উত্তর তোমার শুধু হুহুঙ্কারে কহে—চাহি চাহি।...('সিন্ধু উদ্দেশে')
[তুলনীয়—রবীন্দ্রনাথের 'সিন্ধুতরঙ্গ' (মানসী)]।

৫। অনেক খুঁজে এলায় যদি
সে এক ভাবনা—
অন্ধকারের আড়াল ভেদি'
যাই কি-যাব না।
এমন সময় আঁধার ঠেলে
যেমন করে কাছে এলে,—

তেমন করে আশা যে আর
কোথাও পাব না।.........
ওগো আমার দুঃখরাতের
আঁধার সরণী।
ভিড়াও তোমার আপন ঘাটে
প্রাণের তরণী।·· (দেয়ালী)।

[তুলনীয়—রবীন্দ্রনাথের 'খেয়া' কাব্য]।

বলাবাহুল্য এইসব দৃষ্টান্তে যতীন্দ্রমোহন রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে শুধু কবিতার ভাষা-ছন্দ-স্তবকবন্ধটুকুই গ্রহণ কবেন নি, প্রায় সময়েই ভাববস্তুতেও তিনি রবীন্দ্রনাথের কাছে ঋণী। অবশ্য এতে লজ্জিত বা দুঃখিত হওয়ার কিছু নেই; কারণ যদি না যতীন্দ্রমোহন প্রমুখ কবিরা রবীন্দ্রনাথকে সেযুগে অনুকরণ করতেন, তাহলে বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রকাব্যধারার প্রতিষ্ঠা অনেক বিলম্বিত হতো।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথকে অনুকরণ তো সে যুগে অনেক কবিই করে-ছিলেন, যাঁদের প্রতি রবীন্দ্রনাথ নিজেই অনেক সময় প্রসন্ন হতে পারেন নি। অনুকরণেব বিপদ দুবকম,—প্রথমতঃ ক্ষমতার স্বল্পতা অনেক সময়েই আদর্শকে পর্যন্ত বিকৃত করে দেয় (সেযুগে রবীন্দ্রনাথকে সমালোচনা করা হতো রবীন্দ্রানুকারীর রচনা উদ্ধৃত করে), দ্বিতীয়তঃ 'অনুবাদ কবিতা'তেও যেমন স্বকীয়তার প্রকাশ সম্ভব, নির্বাচন বৈশিষ্ট্যে ও ভাষা-ছন্দের প্রয়োগ দক্ষতায় তেমনি 'অনুকরণ কবিতা'তেও স্বকীয়তা স্বীকার্য, এবং স্বকীয়তার অভাব অনুকরণকে রসহীন ও রূপহীন করে তোলে। যতীন্দ্রমোহন বড়ো কবি না হলেও কবি ছিলেন এবং রবীন্দ্রনাথের অনুকরণ করলেও তিনি নিজত্ব হারাননি। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রাসঙ্গিক আলোচনা আমাদের মনে পড়বে: 'পৃথিবীর কতকগুলি প্রথম শ্রেণীর কাব্য, কেবল অনুকরণ মাত্র। ড্রাইডেন এবং বোয়ালোর অনুকারী পোপ, পোপের অনুকারী জনসন। এইরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লেখকদিগের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া আমরা একথা

সপ্রমাণ করিতে চাহি না। বর্জিলের মহাকাব্য, হোমরের প্রসিদ্ধ মহাকাব্যের অনুকরণ। সমুদয় রোমক সাহিত্য, য়ুনানীয় সাহিত্যের অনুকরণ। যে রোমক সাহিত্য বর্তমান ইউরোপীয় সভ্যতার ভিত্তি, তাহা অনুকরণ মাত্র।...... ...তবে প্রতিভাশূন্যের অনুকরণ বড় কদর্য হয় বটে। যাহার যে বিষয়ে নৈসর্গিক শক্তি নাই, যে চিরকালই অনুকারী থাকে, তাহার স্বাতন্ত্র্য কখনো দেখা যায় না'।[৬]

যতীন্দ্রমোহন অনুকরণ করলেও, তাঁর স্বাতন্ত্র্য সেই সঙ্গে আমাদের স্বীকার করতে হবে। তিনি তাঁর ক্ষমতা বুঝে অনুকরণ করেছেন; বিষয় নির্বাচনে তাঁব বিশিষ্টতা ধরা পড়বে; সবচেয়ে বড়ো কথা তাঁর অনুকরণে আদর্শের বিকৃতি ঘটেনি; সার্থক অনুবাদকের মতই তিনি যে নবরূপ সৃষ্টি করেছেন, 'কবিতা' হিসাবে তার স্বতন্ত্র মূল্য আছে।

রবীন্দ্রনাথের কবিতায় যে কবি-ব্যক্তিত্বের আত্মপ্রকাশ, যতীন্দ্রমোহনের কবিতায় তা থাকবার কথা নয়। রবীন্দ্রনাথের মন আর যতীন্দ্রমোহনের মন এক নয়। যতীন্দ্রমোহন নিজের মন জানতেন, তাই ববীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলি-গীতালি-গীতিমাল্য, কিংবা বলাকা-পুনশ্চ-সানাই-এর অনুকরণ তিনি করেন নি। করতে চেষ্টা করলে ব্যর্থতা অনিবার্য হতো। রবীন্দ্রনাথের 'মানসী', 'কল্পনা', 'শিশু' এবং 'পলাতকা' তাঁকে সর্বাধিক প্রভাবিত করে। যতীন্দ্রমোহনের সমগ্র 'বন্ধুর দান' গ্রন্থটি 'পলাতকা'র অনুকরণে লেখা এবং সার্থক অনুকরণ। রবীন্দ্রনাথের অধ্যাত্মবোধ, সঙ্কেতের নিপুণ ব্যবহার, কাহিনী-গ্রন্থনে নাটকীয় সংলাপ, সর্বোপরি সৌন্দর্যের ভাবরূপ যতীন্দ্রমোহনের অনায়ত্ত ছিল। অবশ্য রবীন্দ্র-জীবনদর্শন যতীন্দ্রমোহন গ্রহণ করতে পেরেছিলেন বলেই মনে হয়; যতীন্দ্রমোহন লিখেছেন—

'মৃত্যুর মানে শেষ নয় শুধু—
নবজীবনের সূত্র;
দুঃখের কোল ভরি দেখা দেয়
আনন্দ বরপুত্র।

সুখ ও দুঃখ—চড়া আর খাদ
উঠে নামে ঘুরে ঘুরে—
বেজে উঠে তায় পূর্ণ রাগিনী
জীবন-যন্ত্র-সুরে।'

(জীবন ও মৃত্যু)

কিন্তু যতীন্দ্রমোহনের কৃতিত্ব রবীন্দ্র-ভাবনা ও আত্মভাবনার মিশ্রণ। যতীন্দ্রমোহন রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে পেয়েছেন সৌন্দর্য-দৃষ্টি; কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্যকল্পনা আর যতীন্দ্রমোহনের সৌন্দর্য-কল্পনা এক নয়। রবীন্দ্রনাথের 'নিরুদ্দেশ যাত্রা' কিংবা 'সোনার তরী'র পাশে যতীন্দ্রমোহনের 'খেয়াডিঙি' কবিতাটি রাখলেই, যতীন্দ্র-মোহনের স্বকীয়তা অনুভব করতে পাববো:

'পাটের ক্ষেতের ভিতব দিয়ে ঘাটের ডিঙা বাই—
তবু আমার হাটের সাথে কোনও বাঁধন নাই,
শিরা-উঠা ফাটা হাতে হালের গোড়া ধরি'
আমি শুধু আপন মনে এপার ওপার করি।'

প্রকৃতপক্ষে যতীন্দ্রমোহনই ববীন্দ্রযুগের একমাত্র কবি, যাঁর মধ্যে রবীন্দ্র এবং অ-ববীন্দ্র কাব্য সংস্কাবের বিরোধ নেই বললেই চলে। বাংলা কাব্যেব বিষয়মগ্ন ঐতিহ্যকে তিনি অস্বীকার করেন নি, অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথের আত্মমগ্ন নবজাতককে গ্রহণ করতেও তিনি কুণ্ঠিত হন নি। যতীন্দ্রমোহনেব 'অন্ধবধূ' (পায়ের তলায় নরম ঠেকল কি! আস্তে একটু চল্ না ঠাকুব ঝি) কিংবা 'চাষার মেয়ে' কবিতা ববীন্দ্রধাবার কবিতা নয় অথচ রবীন্দ্রনাথেব পূর্বেও এ জাতীয় কবিতা লেখা সম্ভব ছিল না। এখানেই যতীন্দ্রমোহনের স্বকীয়তা।

অন্যদিকে প্রকাশভঙ্গীর নিজত্বেও যতীন্দ্রমোহনের কবিতা স্বাতন্ত্র্য লাভ করেছে। রবীন্দ্রনাথকে যাঁরা অনুকরণ করেছিলেন, তাঁরা অধিকাংশই ভাবসম্পদকে অধিক প্রাধান্য দিয়েছিলেন; হৃদয়ের আবেগকে কবিতার বিষয় করেছিলেন; কিন্তু রবীন্দ্রকাব্যে ভাব ও রূপের যে বাগর্থ সম্পর্ক, তাঁদের রচনায় শুধু তার অভাবই দেখা গেল না,—শব্দ প্রয়োগ ও বাক্য গঠন, ছন্দ-রক্ষা ও স্তবক নির্মাণে স্বেচ্ছাকৃত অবহেলা তাঁদের 'অনুকরণ কবিতা'কে মূল্যহীন করলো। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত অবশ্য ছন্দ-সিদ্ধি লাভ করেছিলেন, কিন্তু শব্দ নির্বাচন এবং চিত্রকল্প রচনায় তাঁর অমনোযোগ অনেক কবিতারই শেষরক্ষা করতে পারেন নি। আর সত্যেন্দ্রনাথ যেখানে কবিতার

রূপকর্ম সম্বন্ধে অতি-মনোযোগী, সেখানে প্রায়ই ভাবদৈন্য কবিতাকে তাৎপর্যহীন করেছে। যতীন্দ্রমোহন সচেতন শিল্পী ও হৃদয়বান্ কবি। তাঁর কবিতা যখন আমাদের রবীন্দ্রনাথের কবিতাকে স্মরণ করায়, তখন তা শুধু ভাববস্তুর জন্য নয়, প্রকাশ সুষমার জন্যও বটে।

যতীন্দ্রমোহনের কবিতা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ যে মন্তব্য করেছিলেন, তা প্রশস্তিমূলক হলেও, সেই যুগের অন্য কোনো কবির সম্বন্ধে কথাগুলি যে প্রযোজ্য হতে পারে না তা আমরা সহজেই বুঝতে পারি: '........তোমার লেখনী তোমার কবিতাকে পক্ষিরাজ ঘোড়ার মতন এখনো সমান বেগে বহিয়া লইয়া চলিয়াছে ; এখনো তাহার ক্লান্তির লক্ষণ নাই,...তোমার নিপুণ ছন্দের পায়ে পায়ে অনায়াস নৃত্যলীলার নূপুব বাজিতেছে, আবার তাহার হাতে ও মাথায়, কানায়-কানায়-ভরা বিচিত্র রসের থালি। বোধ হয় এককালে ইন্দ্রসভার রঙ্গভূমিতে তাহার স্থান ছিল, কোন একটা পদস্খলনের অভিশাপে মর্তে আসিয়া পড়িয়াছে, কিন্তু নন্দনের লীলা ভোলে নাই এবং অমরাবতীর প্রতি এখনো তার দাবী আছে। কিন্তু অমরাবতীর কোন্ মহলেব প্রতি তোমাব কবিত্বেব পক্ষপাত বোঝা গেল না—মনে হইল সকল দিকেই তাহাব লোভ—কি শিবের কৈলাসে কি বিষ্ণুর বৈকুণ্ঠে, কি সেই অলকাপুবীতে যেখানে বিরহিণীর দীর্ঘ-নিঃশ্বাসে শিশিরার্দ্র শরতের করুণের শিউলিগুলি রাত না পোহাতেই ঝরিয়া ঝরিয়া পড়িতেছে।'

১। জীবনানন্দ দাশ: 'কবিতা কথা' (১৩৬২) পৃঃ ৯।

২। W. H. Auden & John Garret: The Poet's Tongue (London 1935) ভূমিকা।

৩। যতীন্দ্রমোহন বাগ্‌চী: র-যু-সা, পৃঃ ১৬-২৫।

৪। বুদ্ধদেব বসু: 'রবীন্দ্রনাথ ও উত্তর সাধক' (সাহিত্যচর্চা') ১৩৬৮, পৃঃ ১১০।

৫। 'জীবন এবং জগৎ সম্বন্ধে অস্তি-বাচক প্রত্যয়' একান্তভাবে রবীন্দ্র-নাথের কাছ থেকে পাওয়া নয়। দ্রঃ 'প্রশ্ন এবং প্রত্যয়'।

৬। বঙ্কিমচন্দ্র: 'অনুকরণ' (বিবিধ প্রবন্ধ, ব-সা-প-সং) ১৩৬৬, পৃঃ-৭১—৭২।

*

কাব্য

'রবীন্দ্রপ্রভাব অতিক্রম করে সত্যকারের ভালো কবিতা লেখা এ যুগে কার পক্ষেই বা সম্ভব হয়েছে? শুধু প্রভাব অতিক্রম করবার ঝোঁকে কাব্যের রাজপথ ছেড়ে বন জঙ্গল হাতড়িয়ে বেড়ানোর প্রয়াস যতীন্দ্রমোহন করেননি। এ যদি দোষ হয়, তবে যতীন্দ্রমোহনের সে দোষ ছিল। রবীন্দ্রকাব্যে যা কিছু ভালো তা নিজের সাধ্যের উপযোগী করে অকুণ্ঠিত ভাবে যতীন্দ্রমোহন গ্রহণ করেছেন নিজের অনেক কবিতায়, গোপন করবার কোন কৌশল অবলম্বন করেননি। লোকোত্তর প্রতিভার অধিকারী রবীন্দ্রনাথের কাব্যরস ঠিকমত গ্রহণ করবার অধিকার অধিকাংশ সাধকের নেই। খালি চোখে রবির দিকে চাওয়াই যায় না, উপযোগী চশমার প্রয়োজন হয়। সোজা বুদ্ধিতে রবীন্দ্রকাব্যও বোঝা যায় না, উচ্চস্তরের কল্পনাশক্তি ও রসবোধ আয়ত্ত করতে হয়। অথচ আমরা সকলেই যুগধর্ম প্রভাবে রবীন্দ্রকাব্যের অনুরাগী। তার হেতু খুঁজতে গেলে যা বুঝি তার চেয়ে যা বুঝি না তার মধ্যে বেশী সন্ধান করতে হয়। এই সন্ধান বিদ্যা ও বুদ্ধিযোগে যাঁরা করেন তাঁদের বলা হয় সমালোচক। কিন্তু মহাকবির সমসাময়িক ও পরবর্তী কবিরাও রসের মধ্য দিয়ে নিজের বৈশিষ্ট্য না হারিয়েও সে কাজ সুন্দরভাবে করে যান। যতীন্দ্রমোহন সেই কবিদের অগ্রণী ও শ্রেষ্ঠ। রবির তেজ নিজের বুকে সম্পূর্ণ ধারণ করে তাকে শীতল সুন্দর ও সাধারণ চোখের গ্রহণ যোগ্য জ্যোৎস্নারূপে এই ধরণীতে পাঠিয়ে দেয় আকাশের চন্দ্র। সরল ভূবিজ্ঞানে লেখা আছে—চন্দ্রের নিজের আলো নেই, সে সূর্যের আলোয় আলোকিত মাত্র, কিন্তু তারাগুলি এক একটি বৃহৎ সূর্য। এতে রসরাজ্যে পূর্ণচন্দ্রের গৌরব ক্ষুণ্ণ হয় না, মিট্‌মিটে তারাগুলির গৌরবও বাড়ে না। সূর্য—সূর্য; চন্দ্র—চন্দ্র; রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ; যতীন্দ্রমোহন, যতীন্দ্রমোহন।'

— যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত (পূর্বাচল ফাল্গুন ১৩৫৪)

*

সেযুগেও দেখেছি, এযুগেও তার ব্যতিক্রম নেই। অবশ্য 'এযুগ' অর্থে রোমান্টিক যুগ। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ থেকে উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত—শতাধিক বছর এই পল্লীপ্রীতি আর প্রকৃতি বন্দনা অনিবার্য এবং আকাঙ্ক্ষণীয়। 'It was thus weighted that Nature arrived at the nineteenth century, when she was stripped of Love and battlements and every adornment, and stood alone'. [২]

ত্রয়োদশ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যকে মধ্য যুগের লক্ষণাক্রান্ত বলে মনে করা হয়। বিশেষ অর্থেই তা পল্লী-সাহিত্য। বাংলা দেশে গ্রামের প্রাধান্য সর্বথা স্বীকার্য। গ্রামের মানুষ এবং তাদের সুখদুঃখ, প্রেম বিরহ নিয়ে রচিত হয়েছে গাথা-গীতিকা-ছড়া। তাতে প্রকৃতির উল্লেখ আছে, কিন্তু সে শুধু মনোভাব প্রকাশের উপায় মাত্র। মঙ্গলকাব্যের বারমাস্যায় প্রকৃতির চিত্র আছে, কিন্তু সেখানে প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের দেনাপাওনার সম্পর্ক ; ব্যবহারিক জীবনে তার প্রভাব বর্ণনা। অবশ্য কালিদাসের 'ঋতু-সংহারে'ও ঋতু মানুষের ভোগ্যবস্তু—বলা যেতে পারে 'ঋতুসংহার' হলো প্রাচীন ভারতবর্ষের প্রাকৃত ভূগোল—কোন্ ঋতুতে কোন্ শস্য, কোন্ ফল, কোন্ ফুল জন্মায়, স্বাস্থ্য কেমন থাকে, বিরহ-মিলনের উত্তাপ বাড়ে কমে, তারই বর্ণনা করা হয়েছে। ফলতঃ ঋতুর ঐশ্বর্য মানব জীবনের পরিপূরকরূপেই গ্রাহ্য হয়েছে, মানুষ নিজের সুখদুঃখকে প্রকৃতির উপর আরোপ করেছে, আর ভেবেছে, প্রকৃতির অন্তর-বাহির সবটুকুই তার একান্ত জানা।

উনবিংশ শতব্দীতে বাংলা সাহিত্যে আধুনিক যুগের সূচনা। ঈশ্বর গুপ্তের খণ্ড কবিতাতেও নয়, মধুসূদনের চতুর্দশপদীতেও নয়, হেম-নবীনের গীতিকাব্য-প্রয়াসেও নয় ; বিহারীলালের 'নিসর্গ সন্দর্শন' (১৮৬৯) ও 'বঙ্গসুন্দরী' (১৮৭০) কাব্যেই প্রথম রোমান্টিক-প্রকৃতি-দৃষ্টির প্রকাশ। বিহারীলাল লিখলেন ঃ

'কভু ভাবি পল্লীগ্রামে যাই,
নাম-ধাম সকল লুকাই,
চাষীদের মাঝে রয়ে,
চাষীদের মত হয়ে,
চাষীদের সঙ্গেতে বেড়াই।
প্রাতঃকালে মাঠের উপর,
শুদ্ধ বায়ু বহে ঝর্‌ঝর্‌।
চারিদিক মনোরম,
আমোদে করিব শ্রম;
সুস্থ স্ফূর্ত হবে কলেবর।
বাজাইয়ে বাঁশের বাঁশরী,
সাদা সোজা গ্রাম্য গান ধরি,
সরল চাষার সনে,
প্রমোদ-প্রফুল্ল মনে
কাটাইব আনন্দে শর্বরী।
বরষার যে ঘোরা নিশায়,
সৌদামিনী মাতিয়ে বেড়ায়;
ভীষণ বজ্রের নাদ,
ভেঙে যেন পড়ে ছাদ,
বাবু সব কাঁপেন কোঠায়;
সে নিশায় আমি ক্ষেত্র-তীরে,
নড়বোড়ে পাতার কুটীরে,
স্বচ্ছন্দে রাজার মত
ভূমে আছি নিদ্রাগত;
প্রাতে উঠে দেখিব মিহিরে।' ৩

এ কবিতা যিনি লিখেছেন, তিনি কিন্তু বাস করেন শহর কলকাতায়, দোতলা পাকা বাড়ীতে। 'পল্লীকবি' এ কবিতা লিখ্‌তেন না, লিখতে পারতেন না। রবীন্দ্রনাথ মন্তব্য করেছেনঃ 'কৃষক-কবি যখন কবিতা রচনা করে, তখন সে মাঠের শোভা, কুটীরের সুখ বর্ণনা করে না—

নগরের বিস্ময়জনক বৈচিত্র্য তাহার চিত্ত আকর্ষণ করে—।' হারফোর্ড বিহারীলালের এই কবিতা পড়লে নিঃসন্দেহে কবিকে 'ওঅর্ডস্বার্থের যুগের কবি' বলেই চিহ্নিত করতেন। 'এমিলি' না পড়েও রুশোর সঙ্গে এই মানস-সাদৃশ্য বিহারীলালের পক্ষে অনিবার্য।

এবং রবীন্দ্রনাথের পক্ষেও। তবে বিহারীলাল যে আবেগকে অনাবৃত ও প্রত্যক্ষভাবে প্রকাশ করলেন, রবীন্দ্রকাব্য তারই ব্যঞ্জনা-সমৃদ্ধ ভাব-চিত্রণ। পল্লীর মানুষ না হয়েও, অথবা না-হওয়ার জন্যই 'মাটির ডাক' তাঁর কানে অত সহজে পৌঁছুলো। আর রবীন্দ্রযুগের কবিদের রচনায় যখন এই বিশিষ্ট নিসর্গসন্দর্শন লক্ষ্য করি, তখন তাকে একান্তভাবে রবীন্দ্রপ্রভাব বলা তাই অন্যায় হবে। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দু'দশকে নাগরিক কবির পক্ষে পল্লীপ্রেম অনিবার্য; প্রকৃতি বর্ণনা স্বতঃস্ফূর্ত।

অবশ্য কাব্যজগতে আরও একবার হাওয়া বদল হলো; য়োরোপে এই শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের সূচনায়, বাংলাদেশে তৃতীয় দশকের অবশেষে। নূতনতর কাব্য-ধারা, যার বৈশিষ্ট্য আপাতত এখানে আলোচনার প্রয়োজন নেই, কিন্তু যে কাব্যধারা নিঃসন্দেহে 'এ্যান্টি-রোমান্টিক'; পল্লী এবং প্রকৃতিতে অরুচি; মুখবদলের জন্য নূতনের সন্ধান; কাব্যেও পালাবদল। সে আর এক যুগের কথা। যতীন্দ্রমোহনের সঙ্গে সে যুগের যোগ সামান্য।

'যতীন্দ্রমোহন, করুণানিধান, কুমুদরঞ্জন ও কালিদাস রায়ের কবিতার উৎস তাঁদের জন্মস্থান পল্লীপ্রকৃতি,' একথা প্রমথনাথ বিশী বিশেষ জোর দিয়ে বলেছেন।[৭] যতীন্দ্রমোহন পল্লীগ্রামকে ভালোবাসেন; গ্রামের ছবি তাঁর কবিতায় বারবার দেখেছি। রবীন্দ্রনাথও অনেকদিন গ্রামাঞ্চলে বাস করেছেন, এবং তারই ফলে আমরা পেয়েছি 'গল্পগুচ্ছে'র কতকগুলি অসাধারণ গল্প; 'চৈতালি'র পল্লীচিত্র, পল্লীরস অভিষিক্ত 'ছিন্নপত্র'। তবু পল্লীগ্রাম রবীন্দ্র-কবিতার উৎস নয়; পল্লীরস রবীন্দ্রকাব্যের

অঙ্গীরস নয়। পল্লীগ্রাম পটভূমি রচনা করেছে, পল্লীর মানুষ চিরন্তন সত্যকে উদ্ভাসিত করতে সাহায্য করেছে; কিন্তু হৃদয়ের যোগ সাধিত হয়নি, তা সম্ভবও ছিল না।

যতীন্দ্রমোহন রবীন্দ্রপ্রভাবিত কবি হয়েও, পল্লীগ্রামের সঙ্গে হৃদয়ে-হৃদয়ে যোগ অনুভব করেছেন। পল্লী স্বতঃসুন্দর বলেই তাঁর কাব্যের বিষয় নয়, পল্লীকে তিনি ভালোবাসেন বলেই পল্লী সদা-সুন্দর। ভালোবাসার আলোকেই, আমরা জানি 'রূপের রেখায় মিলবে রসের রেখা, মায়ার চিত্রলেখা'—এবং 'বস্তু হতে সেই মায়া তো সত্যতর'। আমরা আগেই বলেছি, পল্লীতে জন্ম বলেই যতীন্দ্রমোহন পল্লীর মোহনরূপ এঁকেছেন তা নয়, রোমান্টিক কবি বলেই পল্লীর প্রতি তিনি স্বাভাবিক আকর্ষণ অনুভব করেছেন, এবং এই স্বাভাবিক আকর্ষণের সঙ্গে মিলেছে তাঁর জন্ম-সংস্কার। সকল রোমান্টিক কবির ক্ষেত্রে এই জন্ম-সংস্কার সমান নয়, তাই রোমান্টিক কবিতায় পল্লীচিত্র সর্বদা জীবন্ত নয়। যতীন্দ্রমোহনের সমসাময়িক সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত এবং কিরণধন চট্টোপাধ্যায়ের কবিতায় পল্লীগ্রামের বর্ণনা তাই প্রায়-কৃত্রিমতার ধার ঘেঁষে গেছে। এইখানেই যতীন্দ্রমোহনের পল্লী-কবিতার বিশিষ্টতা।

নদীয়া জেলার যে ছোট গ্রামটিতে কবির জন্ম, যেখানে কেটেছে তাঁর শৈশব ও বাল্যের দিনগুলি, সে গ্রামের কথা কোনদিন বিস্মৃত হতে পারেননি তিনি। গ্রামের বাঁশবাগানের ঝোপ, আর রাঙামাটির গোরুর গাড়ীর পথ; পদ্মদীঘির পার আর সঙ্কীর্তনের সুর—সেখানেই কবির মন পড়ে আছে। কবির মুখে তাই শুনি:

ঐ যে গাঁ-টি যাচ্ছে দেখা 'আইরি'-ক্ষেতের আড়ে—
প্রান্তটি যার আঁধার-করা সবুজ কেয়াঝাড়ে,
পূবের দিকে আম-কাঁঠালের বাগান দিয়ে ঘেরা,
জটলা করে যাহার তলে রাখাল বালকেরা—
    ঐটি আমার গ্রাম—আমার স্বর্গপুরী,
    ঐখানেতে হৃদয় আমার গেছে চুরি। (ঐ যে গাঁ-টি)

চমকিত হওয়ার মত কোনো বার্তা নিয়ে এ কবিতা আমাদের হৃদয়কে ধাক্কা দেয় না; কথাটি পুরানো, হয়ত সাধারণ। কিন্তু সহজ কথা যায় না বলা সহজে। এখানেই 'Spontaneous overflow of powerful feeling' এর প্রয়োজন; এবং কবির স্বতঃস্ফূর্ত অকৃত্রিম আবেগের প্রমাণ।

'পল্লীকবিতা' যাকে বল্‌ছি, তাতে প্রজ্ঞাদৃষ্টি বা জ্ঞানগর্ভ বাক্য নেই; বড়ো কথা—বড়ো ভাব এ কবিতার অবলম্বন নয়। সংবাদ যা আছে, তাও বাইরের জগতের সাময়িক তথ্য-সংগ্রহ নয়। হৃদয়ের সংবাদ বলেই তা এত সহজে হৃদয়কে স্পর্শ করে। বলেছি, প্রেমের মোহাঞ্জনেই প্রেমিক-প্রেমিকা সুন্দরকে আবিষ্কার করে। কিন্তু একে মোহই বা কেন বলবো! মোহ তো সাময়িক, মোহ তো মিথ্যা। ভালোবাসা মিথ্যা নয়; অন্ততঃ যতীন্দ্রমোহনের গ্রামকে ভালোবাসা কখনোই মিথ্যা নয়। আর এই ভালোবাসা সত্য বলেই 'পল্লীকবিতা' নিছক পল্লী বর্ণনায় পরিণত না হয়ে, হৃদয়ের উত্তাপে জীবনের স্পন্দন লাভ করেছে। দু-একটি দৃষ্টান্ত নিলেই কথাটির যাথার্থ্য প্রমাণিত হবে:

তুমি লুকিয়ে বেড়াও যে মুখখানি, —দেখেছি কালরাতে—
আমার পদ্মাচরের ভাঙা ঘরের শূন্য আঙিনাতে।
সে যে কত রাতের বিফল জাগা সফল করে দিয়ে
শেষে কালকে আমার চোখের ফাঁদে পড়ল ধরা প্রিয়ে।

তখন নিঝুম রাত্তি, সুপ্ত সবাই রুদ্ধ-দুয়ার ঘরে,
ভিজে শেওলা-নীড়ে ঘুমায় মরাল, চখা ঘুমায় চরে;
কেবল বুনো ঝাউয়ের বনে বেড়ায় ব্যস্ত-ব্যাকুল বায়,
আর আমি ছিলাম জেগে আমার ঘরের জানালায়।

(জ্যোৎস্না লক্ষ্মী)

অথবা,

মাথার উপরে মৌমাছিদের গুঞ্জন আসে কানে;
থেকে থেকে দূরে ঘুঘুর আলাপ কত কথা মনে আনে।
ঝরি ঝরি পড়ে জামরুল রেণু বাঁশের কুহরে কোথা বাজে বেণু,
দূর কোণে ওই নামিতেছে ধেনু তৃষাতুর, জলপানে।

মাছরাঙা ওই করমচা-শাখে তাক্ করি বসি জলে ;
এক পায়ে ভর দিয়া হোথা বক ঝিমাইছে তারি তলে ;
দূরে ঘন বনে কাঠঠোকরার উদাস ধ্বনিটি কাঁদে বারবার,
এক-ই কথা যেন করে সে প্রচার—জীবন অসাব বলে।

(চন্দন দীঘি)

এখন একে 'পল্লী-কবিতা' বল্‌বো, না 'রোমান্টিক কবিতা' বল্‌বো? চিত্র হিসাবে সুন্দর, কিন্তু চিত্র বলেই সুন্দর নয়। এখানেই কুমুদরঞ্জনের 'পল্লী-কবিতা'র সঙ্গে যতীন্দ্রমোহনের 'পল্লী-কবিতা'র পার্থক্য। কুমুদরঞ্জন অভিজ্ঞতাই সারসর্বস্ব বলে জানেন ; যতীন্দ্রমোহন অভিজ্ঞতাকে অবলম্বন করেন কিন্তু উত্তীর্ণ হয়ে যান সেই অভিজ্ঞতার জগৎ। কবির সৌন্দর্য পিপাসা, রসমুগ্ধতা এবং জীবন-জিজ্ঞাসা পল্লীচিত্রকে অসামান্য তাৎপর্য দান করে। সেইজন্য এগুলিকে 'পল্লী-কবিতা' হিসাবে চিহ্নিত করা, এক হিসাবে এদের প্রতি অবিচার করা। যতীন্দ্রমোহনের 'পল্লীকবিতা'গুলি তাই পল্লীগ্রাম মাহাত্ম্যে নয়, কাব্য উৎকর্ষেই মূল্যবান।

২.

যতীন্দ্রমোহন 'প্রকৃতির কবি',—'কাব্য-সত্য' হিসাবে কথাটা মেনে নিতে পারি ; কিন্তু সমালোচনার পরিভাষায় 'প্রকৃতির কবি' যাঁকে বলি, তিনি কখনোই যতীন্দ্রমোহন নন। "বিদ্যালয়ে ইংরেজি কাব্যের পাঠ নিতে গিয়ে যখন শোনা যায় যে ওঅর্ডস্বার্থ প্রকৃতির কবি তখন সহজ বুদ্ধিতে সংশয় লাগে। প্রকৃতির কবি কোন্ কবি নন? প্রকৃতির লীলাবৈচিত্র্য অন্ততঃ কখনো কখনো সাড়া না তোলে এমন মন যখন সাধারণের মধ্যেও বিরল, তখন কবি নামের যোগ্য যে-কোনো ব্যক্তির সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়বৃত্তিকে তীব্রভাবেই তা নাড়া দেবে, তাতে সন্দেহ কী? শেক্সপীয়ার কি প্রকৃতির কবি নন? শেলি? কীট্‌স? যদি বলা হয় ওঅর্ডস্বার্থ জড় প্রকৃতির মধ্যে এক জীবন্ত ও

ও সর্বব্যাপী সত্তা খুঁজে পেয়েছিলেন, সে কথা মানবো, কিন্তু সকল কবির কাছেই তো প্রকৃতি জীবন্ত, এবং এ উপলব্ধি শেলির মতো তীব্র অন্য কোন্ কবিতে তা জানি না। যদি বলা হয়, ওঅর্ডস্বার্থের প্রকৃতি প্রেম ছিল তাঁর পক্ষে ধর্মের শামিল, সে কথা অস্বীকার করবো না; কিন্তু সেই ধর্মের সারতত্ত্ব অ্যাজ ইউ লাইক ইট-এর নির্বাসিত ডিউক খুব সংক্ষেপেই কি বলেননি—হয়তো কিঞ্চিৎ তাচ্ছিল্যের সুরে—যখন তিনি খুঁজে পেয়েছিলেন 'tongues in trees, books in the running brooks, sermons in stones, and good in everything?' এর বেশি ওঅর্ডস্বার্থ কী বলেছেন?

"তবে এটা সত্য যে প্রকৃতি ছাড়া অন্য কোনো বিষয়ে ওঅর্ডস্বার্থ কবিতা লেখেননি, বা লিখলেও সফল হননি। সেই জন্যে ইংরেজি সাহিত্যের ইতিহাসে তিনি প্রকৃতির কবি লেবেল-আঁটা। কবিদের গায়ে লেবেল-আঁটা থাকলে ডক্টরেটডিগ্রিকামীদের সহায়তা হয়, কিন্তু রসোপলব্ধিতে ব্যাঘাত ঘটতে পারে। প্রকৃতি-বিষয়ক কবিতার সমস্তটা ক্ষেত্র যেন ওঅর্ডস্বার্থের দখলে, এই রকম একটি ধারণা যদি আমাদের মনে জন্মায়, এবং তার ফলে পরবর্তীযুগের যে-সব কবিতে প্রকৃতির সম্বন্ধে নতুন রকমের অনুভূতি ধরা পড়ে তাঁদের কাব্য সম্বন্ধে যথেষ্ট মনোযোগী কি শ্রদ্ধাবান হতে যদি আমরা ভুলে যাই, সেজন্য আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্কীর্ণ শিক্ষাই দায়ী। প্রকৃতি সম্বন্ধে ওঅর্ডস্বার্থের মনোভঙ্গি তো একমাত্র নয়, এবং ভিন্ন মনোভঙ্গি আমাদের অনেকের পক্ষেই অধিকতর গ্রাহ্য হতে পারে।

"আমাদের কবিদের মধ্যে অবশ্য রবীন্দ্রনাথই প্রকৃতির কবি হিসেবে প্রধান। এ-কথা বললেও ভুল হয় না যে তাঁর কাব্যের প্রধান বিষয়ই প্রকৃতি। যত কবিতা ও গান তিনি লিখেছেন, তার বেশির ভাগই তো সোজাসুজি ঋতুসংক্রান্ত। তাছাড়া তাঁর 'জীবন দেবতা'র উপলব্ধিও মুখ্যত প্রকৃতির ভিতর দিয়ে; তাঁর মধ্যযুগের কবিতাগুলিতে এ বিষয়ে নিঃসংশয় সাক্ষ্য পাওয়া যাবে।

"এক হিসাবে সকল কবিই প্রকৃতির কবি, এ কথা পূর্বে বলেছি। কিন্তু সকল কবিকে ঐ আখ্যা দেওয়া যায় না; কারণ সকলের পক্ষেই প্রকৃতি একমাত্র কিংবা প্রধান বিষয় নয়। অনেক কবির পক্ষে প্রকৃতি মানব জীবনের নানা অভিজ্ঞতার পটভূমিকা; অনেকের পক্ষে ইন্দ্রিয়ের বিলাস, আবার কারো কারো পক্ষে আমাদের মনের অবস্থার প্রতিরূপ মাত্র। প্রকৃতিকে নিবিড়ভাবে অনুভব না করেন এমন কোনো কবি নেই; কিন্তু সমগ্র জীবনকে প্রকৃতির ভিতর দিয়েই গ্রহণ ও প্রকাশ করেন এমন কবির সংখ্যা অল্প। তাঁরাই বিশেষ ভাবে প্রকৃতির কবি।"[৫]

যতীন্দ্রমোহনকে 'বিশেষভাবে প্রকৃতির কবি' হয়ত বলা যায় না, কিন্তু রোমান্টিক কবির প্রকৃতি-প্রাণতা আমরা তাঁর কবিতায় লক্ষ্য করেছি। ওঅর্ডস্বার্থ তাঁর কিছু কবিতাকে ফ্যান্সি-প্রধান বলে নির্দেশ করেছিলেন। লঘুপক্ষ কল্পনা প্রকৃতির সৌন্দর্যে বিস্তার লাভ করে; তত্ত্ব কথার গভীরতায় নয়, রসাবেশের আত্মমুগ্ধতায় কবি-প্রাণের উচ্ছলতা প্রকৃতিকে আশ্রয় করে প্রকাশিত হয়। সত্যেন্দ্র-নাথের অধিকাংশ কবিতা এই দিক থেকে 'ফ্যান্সি-প্রধান'। যতীন্দ্রমোহনের এই শ্রেণীর অনেকগুলি কবিতা আছে। এই কবিতাগুলিতে ধ্বনি-চিত্রের স্বাভাবিক প্রাধান্য আমাদের বাসনা-লোকে কোনো কম্পন সৃষ্টি করে না; আমাদের মনের মধ্যে লুকিয়ে থাকা শিশু-প্রবৃত্তি শ্রবণেন্দ্রিয়ের তৃপ্তিতে এবং বর্ণোজ্জ্বল চিত্রকল্পনায় অপার তৃপ্তি লাভ করে। যেমন—

দেখ্ ঘাসের ডাঁটায় ফড়িং ঘুমায়
সবুজ-স্বপন-সুখে,
দেখ্ পদ্মকোরকে অচেতন অলি
শেষ মধুকণা মুখে!
হেথা ঝিঁঝির ঝিঁঝিট তান
দেখ নিশি শেষে অবসান.

ছোট টুনটুনিদের গান
এবে বিরত ক্লান্ত বুকে ;—
দেখ্ মোহ-মূর্চ্ছিত মুখর ধরণী,
সব ধ্বনি গেছে চুকে।

(স্বপ্নদেশ)

কিংবা,

চিক্ মিক্ ঝিক্ মিক্ রবি করে ধিক্ দিক্,
ঝিক্ মিক্ চিক্ মিক্ কিছু ওর নাই ঠিক,
ঝম্‌ঝম্ ঝম্‌ঝম্ এবে দেখি কম্‌কম্
কই কই, কোথা গেলো, ইঁচা, বাচা, চাঁদা, চেলা—
ঐ গেল সরিয়া গিরিমাঝে মরিয়া।

(ঝরণা ঝারা)

উৎকৃষ্ট কবিতার নিদর্শন এ নয় ; কিন্তু এ হলো যতীন্দ্রমোহনের একটি দিক। অন্যদিকে পরিচিত জগৎ, তুচ্ছ বস্তু, অনুজ্জ্বল পরিবেশও রোমান্টিক কবির মায়াদণ্ডের স্পর্শে অপরূপ-অসামান্য হয়ে উঠেছে। ভুঁই চাঁপা, নেবু ফুল কিংবা ফণী-মনসার ফুলের কবি-প্রসিদ্ধি নেই বটে, কিন্তু প্রকৃত কবির কাছে তারাই সৌন্দর্যের বার্তাবহ। অবশ্যই প্রকৃতি-চিত্র হিসাবে নয়, অনুভবের স্পর্শে এই পরিচিত ফুলও লাভ করে রূপক-মূল্য। হয়ত রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে পাওয়া, অথবা রোমান্টিক কবির এই-ই হলো স্বাভাবিক দৃষ্টিভঙ্গী,—

মরু মালঞ্চে আমি কাঁটা-ঘেরা ফণী-মনসার ফুল—
প্রকৃতির এই সৃজন কাব্যে রূঢ় ছন্দের ভুল!
তবু এই বুকে বসে মৌমাছি,
টুনটুনি এসে করে নাচানাচি,
প্রজাপতি তার পালক বাঁচায়ে ঘুরে-ফিরে চারি পাশে ;
শর শয্যায় শুয়ে শুয়ে তবু মুখে মোর হাসি আসে!

(ফণী-মনসার ফুল)

যতীন্দ্রমোহনের রচিত নিসর্গ-চিত্র হয়তো আধুনিক পাঠকের কাছে অতিরিক্ত সহজ ও সরল বলে মনে হবে। কিন্তু এই সরলতা পল্লীসাহিত্যের দান নয়, এবং কাব্যে ব্যঞ্জনা ও অন্তর্মুখিতার অভাব আধুনিক পাঠকের ভালো না লাগলেও, সাহিত্যাদর্শ হিসাবে কোনোক্রমে নিন্দনীয় নয়।[৬] ক্লাসিক সাহিত্যও সরলতা এবং স্পষ্টতা, প্রত্যক্ষতা এবং বহির্মুখিতার দ্বারা চিহ্নিত। যতীন্দ্রমোহন রোমান্টিক কবিমনের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও ক্লাসিক-কাব্য গঠন সম্পূর্ণভাবে আয়ত্ত করেছিলেন। যে সংহতি এবং ভাস্কর্য-কৌশল বিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে অপ্রধান কবিদের মধ্যে একেবারেই দেখা যায়নি, যতীন্দ্রমোহনের কবিতায় তার সুষ্ঠু প্রয়োগ দেখলুম। যতীন্দ্রমোহনের প্রকৃতি বর্ণনা তাই বিশিষ্টতা অর্জন করেছে: সমসাময়িক কবিরা যখন রবীন্দ্রনাথের অন্ধ অনুকরণের দুর্বল প্রয়াসে ব্যক্তিত্বহীন, তখন যতীন্দ্রমোহন রবীন্দ্রনাথকে স্বীকার করেও স্বকীয়তা প্রদর্শনে সক্ষম। ক্লাসিক কাব্যলক্ষণ রোমান্টিক কবির রচনায় যতখানি পাওয়া সম্ভব, যতীন্দ্রমোহনের কবিতায় তা পাওয়া যায়ঃ

শরাস্তৃত সরোবর ; তীরে তীরে তারি তালীবন শ্রেণী।
শ্যামল সরসীশিরে পদ্ম বিভূষণা শৈবালের বেণী।
ধীরে নামে সন্ধ্যাসতী ধূসর অঞ্চল অম্বরে লুটায়ে ;
ঝিল্লীর মঞ্জীর-মালা ঝিমিঝিমিঝিমি বাজে পায়ে পায়ে!

(সরোবরে সন্ধ্যা)

যতীন্দ্রমোহনের এই নিসর্গ-চিত্রে একই সঙ্গে ভাব-চিত্র, ধ্বনি-চিত্র এবং দৃশ্য-চিত্রের সমাহার দেখি। এখানে কবির সহজ দৃষ্টি, নিরাবেগ প্রকাশ এবং সংহত ভাবৈক্য রবীন্দ্রানুসারী কবি সমাজের শিথিল, অস্পষ্ট, পুনরুক্তিসর্বস্ব দুর্বল চরণসমাহার কবিতাগুলির সঙ্গে স্পষ্ট একটা পার্থক্য নির্দেশ করছে। যতীন্দ্রমোহন পল্লী-প্রকৃতিকে কাব্যের বিষয়রূপে গ্রহণ করলেও, তিনি পল্লী-কবি নন, এই কথাটুকু প্রমাণ করার জন্য উপর্যুক্ত দৃষ্টান্তটি যথেষ্ট বিবেচনা করি।

১। C. H. Herford : The Age of Wordsworth (London 1897)p xvi.

২। Viola Meynell : An Anthology of Nature Poetry (London 1942) ভূমিকা পৃঃ ১৩।

৩। বিহারীলাল চক্রবর্তী : বঙ্গসুন্দরী (১৮৭০)। গ্রন্থাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড (১৩২০) পৃঃ ৭—৯।

৪। 'সুতরাং পল্লীর প্রকৃতি এবং পল্লীর মানুষের প্রতি যে তাঁহাদের প্রীতি, প্রত্যক্ষ জীবন হইতেই তাহার জন্ম হইয়াছে, ইহা তাঁহাদের কাহারও কোন রোমান্টিক চিন্তার বিলাসিতা মাত্র ছিল না।'

—আশুতোষ ভট্টাচার্য : কবি যতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্যের শ্রেষ্ঠ কবিতা (১৯৬৩) ভূমিকা।

৫। বুদ্ধদেব বসু : কালের পুতুল (১৯৫৯) পৃঃ ২৬-২৭।

৬। দ্রঃ—'The rationalistically-minded, moderate and disciplined middle class,on the other hand, often favours the simple, clear, uncomplicated forms of classicistic art and is no more attracted by the indiscriminate and shapeless imitation of nature than by the whimsical imaginative art of the aristocracy.'—Arnold Hauser : The Social History of Art, Vol III, (London 1962) পৃঃ ১২৩।



হৃদয়ের সংবাদ

রোমান্টিক কাব্যে প্রকৃতি এবং মানব উভয়কেই স্বীকার করা হলেও, মানব অপেক্ষা প্রকৃতির প্রাধান্য অনিবার্য। শেলী কিংবা কোল্‌রিজের কাব্যে নিঃসন্দেহে, এমনকি কীট্‌সের বিষণ্ণ রক্তাক্ত অন্তর-অভিজ্ঞতাতেও বহির্জগৎ এবং মানব সংসারের স্থান নগণ্য। বর্তমান আলোচনায় রোমান্টিক কাব্যের এই বিশিষ্ট প্রবণতা বিশ্লেষণের সুযোগ নেই, তবু বাংলা কাব্যের ক্ষেত্রে আমাদের সহজেই মনে পড়ে রবীন্দ্রযুগের অন্যতম প্রধান কবি স্বর্গত সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত কিংবা বয়োজ্যেষ্ঠ জীবিত কবি শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক কদাচিৎ প্রেমের কবিতা লিখেছেন। অবশ্যই সত্যেন্দ্রনাথের কবিতায় মানবতার জয়গান আছে, আর কুমুদরঞ্জনও বৈষ্ণবীয় 'সবার উপর মানুষ সত্য' নীতিকে স্বীকার করেন; কিন্তু জীবনের সুখ দুঃখ আনন্দ বেদনা, কান্নাহাসির গঙ্গা যমুনায় ডুব দেওয়া ও ঘট ভরে নেওয়ার দৃষ্টান্ত বিরল। অথচ রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতির কবিতাতেও হৃদয়ের সংবাদ মুখ্য স্থান গ্রহণ করেছে; 'বরষার রূপ হেরি মানবের মাঝে' কিংবা 'এমন দিনে তারে বলা যায়',—এখানে প্রকৃতি এবং মানবের মধ্যে পরস্পরস্পর্ধিত্ব সমাবেশ নিত্য ঘটে। যতীন্দ্রমোহন রবীন্দ্রনাথের কাছে কাব্য-দীক্ষা নিয়েছিলেন, এ কথা বলার অর্থ, যতীন্দ্রমোহনের কাব্যে হৃদয়ের সংবাদ সর্ব ব্যাপ্ত এবং যতীন্দ্রমোহন রবীন্দ্রযুগের অন্যান্য কবিদের তুলনায় স্বতন্ত্র কবি-ব্যক্তিত্বের অধিকারী। যতীন্দ্রমোহনের রূপানুরাগ এবং সৌন্দর্যপিপাসা নিসর্গ জগতে সম্পূর্ণ তৃপ্তি লাভ করেনি, অতীন্দ্রিয় ভাবলোকের অলকাপুরীতে বিশ্রাম গ্রহণ করেনি, যতীন্দ্রমোহন এই ধূলিধূসরিত মর্ত্য পৃথিবীর অতিপরিচিত মানব-মানবীর মধ্যে হৃদয়ের সঙ্গী আবিষ্কার করেছেন, এবং সেই মানব-মানবীই তাঁর কাব্যের অন্যতম প্রধান বিষয়।

(অবশ্যই যুগের প্রবণতা অর্থাৎ সত্যেন্দ্রীয় ফ্যান্সি-চারণাকে অস্বীকার করতে পারেননি যতীন্দ্রমোহন, অনায়ত্ত রবীন্দ্র-কল্পনার দূরাভিসারও যতীন্দ্রমোহনকে বিপথগামী করেছে ; এবং হৃদয়ের সংবাদও তাই কখনো অতি-কল্পনার প্রশ্রয়ে লঘু উচ্ছ্বাসে রূপান্তরিত। 'কেয়াফুল' কবিতায় বর্ষণমদির শ্রাবণ-সন্ধ্যায় রূপসী পসারী-বালার আবির্ভাব নাটকীয়তার সৃষ্টি করেছে বটে, কবির রোমান্টিক যন্ত্রণাও আভাসিত করেছে, কিন্তু হৃদয়ের গভীরতম বেদনা সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য হয়ে ওঠেনি ; 'Fantasy' হিসাবে চমৎকার কিন্তু 'Phantasy'-র মূল্য সামান্যই।[১] যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের শ্লেষ তাই মর্মান্তিক হওয়া সত্ত্বেও অব্যর্থ :

'সে সব কবির বেলা,—
শ্রাবণের সন্ধ্যাবেলা,
দুয়ারে তরুণী পশারিণী,
তনু দেহে সিক্ত বাস
নয়নে মিনতি-ফাঁস,
ফুল নিয়ে করে বিকিকিনি।' [২]

'কচিডাব' বিক্রেতা বৃদ্ধও কল্পনার সামগ্রী, কিন্তু সম্ভাব্যতার সীমায় অবস্থিত বলেই বিশ্বাসযোগ্য ও হৃদয়স্পর্শী। অবশ্য যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত রবীন্দ্রযুগের যে 'fantasy'-প্রিয়তাকে ব্যঙ্গ করেছেন, (তুঃ সত্যেন্দ্রনাথের লালপরী, নীলপরী, বিদ্যুৎপর্ণা) তার কাব্যমূল্য একেবারে নেই তা নয়, কিন্তু হৃদয়ের সংবাদ বহন করে না বলেই তা কৃত্রিম এবং আংশিক ব্যর্থ।

এখানে বলা ভালো, 'কল্লোল'-যুগের তথাকথিত আধুনিক কবিতার মধ্যে বাস্তব স্বীকৃতি সত্ত্বেও হৃদয় সংবেদ্যতা সামান্য। যতীন্দ্রমোহনের কবিতাও 'কল্লোল'-এ প্রকাশিত হয়েছিল, এবং অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত এই ঘটনাটিকে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বিবেচনা করেছেন।[৩] রবীন্দ্রকাব্যে দেহবিস্মৃতি মূল সুর না হলেও, তার অপ্রাধান্য স্বীকার্য ; 'কল্লোলীয়'রা প্রেমের কবিতা রচনায় দেহ ও

মন উভয়ের সমপ্রাধান্য দিলেন, অথবা প্রথম উন্মাদনায় দেহই অতিরিক্ত প্রাধান্য পেল। যতীন্দ্রমোহনের রূপানুরাগ স্বভাবতই নারীর বহিঃসৌষ্ঠবকে অস্বীকার করে নি, এবং 'কল্লোল'-এ প্রকাশিত 'যৌবন-চাঞ্চল্য' তাই যতীন্দ্র-কাব্যসংগ্রহে বিরল ব্যতিক্রম নয়।

টস্‌টসে রসে ভরপুর—
আপেলের মত মুখ আপেলের মত বুক
পরিপূর্ণ প্রবল প্রচুর ;
যৌবনের রসে ভরপুর।

(যৌবন-চাঞ্চল্য)

এখানে যে 'আধুনিকতা', তার মধ্যেই কিন্তু যতীন্দ্রমোহনের প্রকৃত কবি-পরিচয় নিহিত নয়, কারণ শুধু প্রতিক্রিয়া বা বিদ্রোহ তাঁর কাব্য প্রেরণা নয়। এই কবিতায় ভুটিয়া যুবতী নারীর যে 'অকারণ পুলক' ও আকস্মিক বিষণ্ণতাকে রূপ দেওয়া হয়েছে, তার উৎস কবির সংবেদনশীল হৃদয়। সুতরাং এ কবিতার আবেদন বহিঃপ্রকাশের চমকে নয়, একটি মানবী চরিত্র সৃষ্টির সম্পূর্ণতায়। এবং এইখানেই যতীন্দ্রমোহন 'কল্লোলীয়' হয়েও 'কল্লোলীয়' নন।

আসলে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গেই যতীন্দ্রমোহনের ঘনিষ্ঠতর মানস সাদৃশ্য। অবশ্য আগেই বলেছি, রবীন্দ্রযুগের অন্যান্য কবিদের রচনায় যেখানে প্রাণহীন অনুকরণ, যতীন্দ্রমোহন সেখানে আন্তর প্রেরণায় জীবন সংরাগকে কবিতায় প্রকাশ করতে পেরেছেন বলেই, তাঁর কাব্য প্রাণোচ্ছল ও সম্পূর্ণ। যতীন্দ্রমোহন যখন লেখেন :

আজি এমন বাদরে, প্রেয়সি,
আমি যে তোমারে চাই—
হেথা আজি মোর মনোবনে
উতলা বহিছে বায়।
ভেঙে-চুরে' সব আগল
জাগিয়াছে আজ পাগল :
এমন সজল বাদল

বিফলে যাবে কি, হায়।—
আজি এমন শ্রাবণে, প্রেয়সি,
আমি যে তোমারে চাই।

(শ্রাবণে)

তখন রবীন্দ্রকাব্যের সঙ্গে প্রায় আক্ষরিক সাদৃশ্য সত্ত্বেও, যতীন্দ্রমোহনের স্বাতন্ত্র্যও প্রমাণিত হয়। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত আধুনিক কবি; এবং এই আধুনিকতার স্বরূপ হলো: 'তাঁর প্রেমের কবিতায় আবেগের তীব্রতা, বাসনা ও বেদনাব অলজ্জিত ও ব্যক্তিগত চিৎকার—যার তুলনা আবহমান বাংলা সাহিত্যে আমরা খুঁজে পাবো না, না বৈষ্ণব কবিতায়, না ববীন্দ্রনাথে, না তাঁব সমকালীন কোনো কবিতে।'[৪] কথাটি হয়তো সম্পূর্ণ সত্য নয়, সুধীন্দ্রনাথের সঙ্গে যতীন্দ্রমোহনেব তুলনাও অসঙ্গত; তবু এই সূত্রেই যতীন্দ্রমোহনের প্রেমের কবিতাব বিশিষ্টতা আমবা অনুভব করতে পারি। যতীন্দ্রমোহন 'আধুনিক' কবির মতই দেহকে স্বীকাব করেন, রবীন্দ্রানুসরণে মনও স্বীকার্য। আব দেহ ও মনেব সংযোগেই যতীন্দ্রমোহনের প্রেমের কবিতা বাস্তব ও অবাস্তবেব অতীত; সর্বেন্দ্রিয়ের প্রকাশে তা ব্যাপ্ত ও বিকশিত; ব্যক্তিগত স্পর্শে তা চিত্ত সংক্রামক। রবীন্দ্রনাথেব কবিতার কথা মনে বেখেই যতীন্দ্রমোহনের একটি কবিতা উদ্ধৃত কবি:

তাই আজি মনে হয়, এ জীবনে হারায়েছি যারে,
অদ্ভুত সমাজনীতি শত লক্ষ অদ্ভুত আচারে
ঘিরিয়া রেখেছে যারে মায়াবীর মন্ত্র গণ্ডী দিয়া—
ধূলায় সে মায়াগণ্ডী একদিন যাবে সে টুটিয়া।
একদিন পাব তারে, স্বর্গ যদি সত্য কভু হয়—
নিশ্চয় সে পাব তারে মৃত্যুহীন জানি সে প্রণয়।
সমাজ বৃহৎ হোক, জগৎ বৃহৎ তারো চেয়ে,
অনন্ত জগৎ শুধু অনন্ত—সে প্রেম রত্ন পেয়ে!

(প্রেম)

বাংলা কবিতার ইতিহাসে যতীন্দ্রমোহনের স্বাতন্ত্র্য ও বিশিষ্টতা এই একটি মাত্র দৃষ্টান্তের দ্বারাই প্রমাণিত হতে পারে। "এতো শুধু 'মানসী'র 'অনন্ত প্রেম'-এর নিখিল বিরহ-মিলন-কথার অনুকরণ মাত্র নয়। দ্বিজেন্দ্রলালের ঠাট্টার আঘাতে, প্রমথ চৌধুরীর বুদ্ধি-বাদিতার প্রহারে, এবং রবীন্দ্রনাথের সূক্ষ্ম ভাবমোক্ষবাদের ফলে সমাজ-সংসার-সচেতন প্রেমের আকৃতি যখন অন্যান্য পুরুষ কবিদের দুর্বল ভাবালুতায় এবং মহিলা কবিদের স্বাতন্ত্র্যহীন তারল্যে নির্বাসিত হয়ে ক্রমশ বড়োই কৃপার সামগ্রী হয়ে উঠ্ছিল, সেই সময়ে জগতের মাটি ছুঁয়ে থেকেও সামাজিক বাধাবিপত্তির মধ্যে অকৃতার্থ প্রেমের পরম সার্থকতা উপলব্ধি করা, এবং সেই উপলব্ধিকে প্রতিদিনের অভ্যস্ত ভাষার সাহায্যে ব্যক্ত করা কম সবলতার কাজ ছিল না। 'কড়ি ও কোমল'-এর সুরে নয়,—'মানসী'র 'অনন্ত প্রেম'-এর সুরেও নয়, 'বর্ষার দিনে'র সুরেও নয়,—অক্ষয় বড়ালেব বিষাদের প্রভাব পরিহার করে,—দেবেন্দ্রনাথ সেনের মধুর মসৃণতার অনুকরণ না-করে, যতীন্দ্রমোহন যে স্বকীয়তার পরিচয় দিয়েছিলেন, সেটি এতদিন সমালোচকদের চোখ এড়িয়ে গেছে বলে মনে হয়।"[৫]

যতীন্দ্রমোহন জীবনের কবি। কিন্তু তাঁর রচিত জীবন-চিত্র বাস্তব অভিজ্ঞতার সাক্ষ্যে সত্য প্রমাণিত হয় বলেই তা মূল্যবান নয়, হৃদয়ের গভীরতম অনুভবের স্পর্শে সেই বাস্তব অভিজ্ঞতা সত্যতর জীবন-অভিজ্ঞান লাভ করে বলেই তা মহৎ কবিতা। এখানে আধুনিকতার প্রশ্ন অবান্তর। যতীন্দ্রমোহনের কবিতায় যে 'আই-বুড়ো কালো মেয়ে'র চিত্রটি পেয়েছি, তা তথ্য হিসাবে সামান্য হয়েও, সত্য হিসাবে অসামান্য হয়ে উঠেছে:

থম থম করে গভীর রাত্রি প্রদীপ-নেবানো ঘরে,
আঁধার-পথের যুগল-যাত্রী তুফানীর বালুচরে।
একের যাত্রা শেষ হয়ে আসে, অন্যের যবে সুরু;
কালের কপালে কোন্ পরিহাসে কাঁপে দুটি কালো ভুরু!

একে কালো মেয়ে, দরিদ্র তায়, বয়স—সে বিশ-পার ;
জগতের চোখে কে-বা তারে চায় ? নিরুপায় চারিধার।
তবু এ রজনী শেষ হয়ে যাবে—যতই ফাটুক বুক !
কাল প্রাতে কোথা নিস্তার পাবে ? দেখাতে হবে না মুখ ?
(আইবুড়ো কালো মেয়ে)

হৃদয়ের সংবাদ বহন করে বলেই এই কবিতা জীবনের সংবাদ দিতে পারছে ; আর এইখানেই ব্যক্তিগত বা সাময়িক ব্যাপারও সঙ্কীর্ণতা অতিক্রম করতে সক্ষম। আধুনিক কবিতাতেও এই একই রূপান্তরের চেষ্টা, ব্যক্তিগত হয়েও ব্যক্তিনিরপেক্ষ, সাময়িক হয়েও নিত্যকালীক হওয়ার চেষ্টা। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের একটি কবিতা প্রসঙ্গতঃ মনে পড়েছে :

ফুল ফুটুক না ফুটুক
আজ বসন্ত।······
লাল কালিতে ছাপা হল্‌দে চিঠির মত
আকাশটাকে মাথায় নিয়ে
এ-গলির এক কালোকুচ্ছিত আইবুড়ো মেয়ে
রেলিঙে বুক চেপে ধরে
এই সব সাত পাঁচ ভাবছিল—

ঠিক সেই সময়
চোখের মাথা খেয়ে গায়ে উড়ে এসে বসল
আ মরণ ! পোড়ার মুখো লক্ষীছাড়া প্রজাপতি !
তারপর দড়াম করে দরজা বন্ধ হবার শব্দ। [৬]

সম্ভবতঃ সুভাষ মুখোপাধ্যায় আধুনিক কবি। রবীন্দ্রনাথ ঠিক এমনটা লিখতেন না। ভাষা-ছন্দ-চিত্রকল্পের কথা বলছি না। আসলে 'কালো কুচ্ছিত আইবুড়ো মেয়ে' সত্য হয়ে উঠেছে ; রবীন্দ্রনাথের 'তিনটাকা মাইনের গুরুমশায়' সত্য হয়ে ওঠেনি। এই খানেই যতীন্দ্রমোহন আধুনিক। কিন্তু আবার বলি, একে

'আধুনিকতা' বলা ভুল। 'জীবনের সঙ্গে ঘনগ্রন্থিতে বাঁধা'[৭]—এই যদি কবিতার মূল কথা হয়, তবে রবীন্দ্রনাথও 'মিথ্যা' নন; যতীন্দ্রমোহন, সুভাষ মুখোপাধ্যায় এবং রবীন্দ্রনাথেও অমিল নেই; আজিকের দিনে 'শিল্পীর দৃষ্টিতে ধরা পড়েছে সাধারণের অনন্যতা। ট্রাম্ কন্ডাকটর, শিক্ষক, রিক্‌শ-চালক, বিজ্ঞানকর্মী, পাটকলের মজুর বা হোটেলের দ্বাররক্ষক কারও বাধা নেই নাটকের নায়ক হতে; যদি শিল্পী তাকে বেদনার মূল্য, মানুষের যথাযথ দাম দিয়ে দেখতে জানেন। উচ্চ আধ্যাত্মিকের কাছে যে সাধারণজনেরা বহু জন্মান্তর বিনা মনুষ্যত্বের অধিকারী নয়, অথবা যাদের জন্যে ধর্মের নিকৃষ্ট বিধান; তাত্ত্বিকের কাছে যারা রাষ্ট্র তথ্য অর্থনীতি বা জৈব তথ্যের সমষ্টি; সেই প্রতিবেশীদের চরম একটি মূল্য আছে শিল্পীর চোখে। তারই দৃষ্টিতে আমাদের সংসারের প্রধান নির্ভরস্থল। রবীন্দ্রনাথের যুগে আছি বলেই এ কথা আরো স্পষ্ট করে বুঝেছি; তিনিই সাহিত্যের মধ্য দিয়ে মানুষের দৃষ্টিপথ খুলে দিয়েছেন। এখন নূতন অভিযানে বেরোতে বাধা নেই।'[৮]

২.

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় লিখেছিলেনঃ 'কাজলা দিদির কবিতাটি সোনার অক্ষরে ছাপান উচিত ছিল।' কবিতাটি বাঙালী পাঠকের অতি পরিচিত এবং অতিপ্রিয়; পাণ্ডিত্যপূর্ণ কোনো বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখে না। একটি ছোট মেয়ের বুকভরা ভালোবাসা তার দিদির জন্য, বোঝা-না-বোঝার প্রান্তে দাঁড়িয়ে দিদির মৃত্যু-ঘটনাটিকে স্মরণ, পল্লী-প্রকৃতির চিরপরিচিতির মাঝখানে হারিয়ে যাওয়া দিদির কথা বারবার মনে আসা; কোনো তত্ত্ব নয়, ঘটনা নয়,—শুধু অনুভবের অকুতি।

বাঁশ বাগানের মাথার উপর চাঁদ উঠেছে ওই—
মাগো, আমার শোলোক বলা কাজ্‌লা দিদি কই?
পুকুর ধারে, নেবুর তলে থোকায় থোকায় জোনাই জ্বলে,—
ফুলের গন্ধে ঘুম আসে না, একলা জেগে রই;
মাগো, আমার কোলের কাছে কাজ্‌লা দিদি কই?

(কাজ্‌লা দিদি)

এ কবিতা পড়তে পড়তে রবীন্দ্রনাথের কোনো কবিতার কথা মনে আসে না; এই সহজ-সারল্য, এই অনাড়ম্বর হৃদয়ের সংবাদ, এই প্রত্যক্ষ বেদনা রবীন্দ্রনাথের কবিতায় নেই। মনে পড়ে একমাত্র বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে; অনিবার্যভাবেই 'পুঁই মাচা' গল্পটি: 'তারপর সে রাত্রে অনেকক্ষণ কাটিয়া গেল। পিঠে গড়া প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে……রাতও তখন খুব বেশি।…জ্যোৎস্নার আলোয় বাড়ির পিছনের বনে অনেকক্ষণ ধরিয়া একটা কাঠ-ঠোক্‌রা পাখী ঠক্-র্-র্-র্ শব্দ করিতেছিল, তাহার স্বরটাও যেন ক্রমে তন্দ্রালু হইয়া পড়িতেছে…দুই বোনের খাইবার জন্য কলার পাতা চিরিতে চিরিতে পুঁটি অন্যমনস্কভাবে হঠাৎ বলিয়া উঠিল—দিদি বড় ভালবাসত….।'[১] কথা সামান্যই; এ যেন পল্লীর সরলতা, জ্যোৎস্নার শুভ্রতা, ঝিঁঝির অক্লান্ত ডাকের মধ্য দিয়ে হৃদয়ের গভীরতম বেদনার সহজ প্রকাশ। হয়তো এ বেদনা শিশু-মনের বলেই, তা এত প্রত্যক্ষ এবং নিরাবরণ।

নাগরিক বয়স্ক মন এই সরলতাকে হারিয়েছে। আর তার জন্যই রোমান্টিক কবিদের স্বতঃ শৈশব-প্রীতি। ব্লেক তাঁর 'Songs of Innocence' কাব্য সুরু করেছেন এই ছোট ভূমিকাটি দিয়ে:

Piping down the valleys wild,
Piping songs of pleasant glee,
On a cloud I saw a child,
And he laughing said to me:
'Pipe a song about a Lamb!'
So I piped with merry chear,
'Piper, pipe that song again;
So I piped: he wept to hear.

ওঅর্ডস্বার্থের সঙ্গে ব্লেকের পার্থক্য অনেক, তবু ওঅর্ডস্বার্থও Songs of Innocence-ই রচনা করতে চেয়েছেন; প্রকৃতির মধ্যে যে সহজ সারল্য, তাকেই আবিষ্কার করেছেন ওঅর্ডস্বার্থ শিশুর মধ্যে। এবং শিশুর মতই সরল গ্রামের মানুষের মধ্যে। একে অবাস্তব

বলা যায় না, অথচ নাগরিক জীবনে অভ্যস্ত পাঠকের কাছে একে বাস্তব বলেও মনে হবে না। একটি মেয়ে মাঠে গান গাইতে গাইতে কাজ করছে কিংবা আসন্ন সন্ধ্যার ম্লান আলোয় হ্রদের ধারে আর একটি মেয়ে কবিকে তাঁর গন্তব্যস্থল জিজ্ঞাসা করছে, কিংবা জোঁক অনুসন্ধানী সেই নিঃসঙ্গ বৃদ্ধ—এরা কত সহজে তথ্যের জগৎ থেকে আমাদের সত্যের জগতে নিয়ে যায়। ওঅর্ডস্বার্থ তথা রোমান্টিক কবি 'broke with tradition, seeking his subjects in the happenings of country life, in the talk of countrymen and children, in the doings and feelings of humble people, or in the emotions aroused in his own heart by the various aspects of the country side.'[১০] রবীন্দ্রনাথের কবিতা নিঃসন্দেহে রোমান্টিক লক্ষণাক্রান্ত কিন্তু তা ওঅর্ডস্বার্থীয় এই প্রাকৃতিক সরলতা এবং শৈশব প্রত্যক্ষতা লাভ করেনি। বলাবাহুল্য এর দ্বারা কবির উৎকর্ষ-অপকর্ষ প্রমাণিত হয় না, কবি-মনের বিশিষ্টতাই প্রকাশিত হয়।

বাংলা সাহিত্যে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পে এই রোমান্টিক বিশিষ্টতা, 'সরলতার সঙ্গীত' অনুভূত হয়। এবং যতীন্দ্রমোহন রবীন্দ্রনাথের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হওয়া সত্ত্বেও, এঁর স্বাতন্ত্র্য এই 'সরলতার সঙ্গীত' রচনায়। বিভূতিভূষণের অনেক গল্পের সঙ্গেই তাই যতীন্দ্রমোহনের কবিতার বিষয় ও ভাবসাদৃশ্য লক্ষ্য করি। 'অন্ধবধূ' কবিতায় স্বামীপ্রেম বঞ্চিতা একটি পল্লীতরুণীর বেদনা ঘটনা হিসাবে তুচ্ছ, কিন্তু তুচ্ছ ঘটনাটির সরল প্রকাশ, প্রকৃতির পরিপটে উপস্থাপনা, বাঙালী গৃহপরিবেশে 'ঠাকুরঝি'র উপস্থিতি, কবিতাটিকে যে অসামান্যতা দিয়েছে, তা আধুনিক কবিতায় সহজলভ্য নয়।

দুঃখ নাইক—সত্যি কথা শোন্,
অন্ধ গেলে কি আর হবে বোন ?
বাঁচবি তোরা—দাদা তো তোর আগে ;

এই আষাঢ়েই আবার বিয়ে হবে,
বাড়ি আসার পথ খুঁজে না পাবে—
দেখবি তখন—বিদেশ কেমন লাগে!
—কি বললি ভাই, কাঁদবে সন্ধ্যা-সকাল?
হা অদৃষ্ট, হায়রে আমার কাপাল!

বিভূতিভূষণ 'মৌরীফুল' গল্পে এমনই এক স্বামীপ্রেম বঞ্চিতা পল্লীবধূর কাহিনী রচনা করেছেন এবং গল্পের শেষাংশ প্রায় কবিতা হয়ে উঠেছে সন্দেহ নেই। যতীন্দ্রমোহনের 'চাষার মেয়ে' কবিতাতেও ননদিনীকে সম্বোধন করে এই একই বেদনার প্রকাশ, বিদেশে যাওয়া স্বামী ঘরে ফেরে না, যদিও এখানে স্বামীর প্রেমে সন্দেহ নেই, কিন্তু বিরহের তীব্রতা প্রথাসিদ্ধ প্রেমের কবিতাকে ছাপিয়ে উঠে একটি দীর্ঘনিঃশ্বাসে রূপান্তরিত হয়েছে,—

ও যার আপন মানুষ নাইক পাশে, সে কি আশে পরান ধরে?
দিদি, কি দিয়ে যে মন গড়া তার, জানি না কোন্ পাথরে॥

(চাষার মেয়ে)

বাংলা কাব্যে একমাত্র লোকসাহিত্যে, মৈমনসিংহ গীতিকায় এর তুলনা আছে। প্রেমের এমন অকুণ্ঠ প্রকাশ, বেদনার এমন প্রত্যক্ষ রূপ, আধুনিক কবিতায় ক্রমেই কমে আসছে। যতীন্দ্রমোহন আধুনিক যুগের কবি হয়েও, এখানেই চিরযুগের রোমান্টিক; অবশ্যই এ কবিতার রস রোমান্সের রস নয়, যদি স্বীকার করি 'রোমান্স বলে একেই—নবীন প্রাণের শিল্পকলা আপনা ভোলাবার'।[১১]

যতীন্দ্রমোহনের কবিতার বিষয় 'জেলের ছেলে', 'জেলের মেয়ে', 'চাষার মেয়ে', 'মালোর মেয়ে', 'কৃষাণীর গান'। কিন্তু আবার বলি উপকরণই কবিতার সারসর্বস্ব নয়; কবিতা ইতিহাস নয়, কবিতা দর্শন নয়, কবিতা হৃদয়ের সংবাদ। উপকরণগত বিচারে যতীন্দ্রমোহন বাস্তববাদী, বিচ্ছিন্ন চরণ-উদ্ধৃতিতে তিনি 'রসতীর্থের পথের

পথিক'। কিন্তু যতীন্দ্রমোহন বাস্তববাদী আধুনিক কবি নন, আবার রবীন্দ্রধারার রোমান্টিক কবিও নন; যতীন্দ্রমোহন স্বতন্ত্র একটি কবি-মনের অধিকারী; অনুভবের সততায়, অভিজ্ঞতার ব্যাপ্তিতে, এবং প্রকাশের সরলতায় যতীন্দ্রমোহন একজন কবি এবং বিশেষ কবি,—এই তাঁর প্রধান এবং শেষ পরিচয়।

১। 'Fancy is here, as often, synonymus with **fantasy,** though that term applies more narrowly to extravagent inventions··· Fantasy differs from **phantasy,** a visionary power that is above whimsy and goes beyond sensory perceptions. The word spelled in this way is also used of the creatures of that power.' —Babette Deutsch : Poetry Hand Book (A Dictionary of Terms) (London 1958) পৃ: ৫১।

২। যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত : 'কচিভাব'। সায়ম্ (১ম সং) পৃ: ১৩৪।

৩। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত : কল্লোল যুগ। (১৩৬৬) পৃ: ৮৬।

৪। বুদ্ধদেব বসু : সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কাব্য সংগ্রহ—ভূমিকা। (১৯৬২)

৫। হরপ্রসাদ মিত্র : কবিতার বিচিত্র কথা (১৯৫৭) পৃ: ২৮৮।

৬। সুভাষ মুখোপাধ্যায় : 'ফুল ফুটুক না ফুটুক'। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতা (১৯৫৭) পৃং ২১৪ ২১৫।

৭। অমিয় চক্রবর্তী : সাম্প্রতিক (১৯৬৩) পৃ : ৮৩।

৮। ঐ ঐ পৃ : ১০—১১।

৯। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় : শ্রেষ্ঠ গল্প (১৩৬৪) পৃ : ২১০।

১০। Emile Legouis : History of English Literature. (London 1953). পৃ: ২৭৯।

১১। রবীন্দ্রনাথ : 'পরিচয়'। সানাই (১৯৫৭) পৃ: ৭২।

✻

পুরাণের নবজন্ম

'পুরাণ' শব্দের অর্থ প্রাচীন। প্রাচীন কালের কাব্যগাথা স্বভাবতই আধুনিক কালেব পাঠককে সম্পূর্ণ তৃপ্তি দিতে পারে না। সমাজ-মন যুগপ্রবণতাকে স্বীকার করে; বিশেষ কালের চিন্তা-ভাবনা, প্রত্যাশা ও প্রাপ্তিব দ্বারা সমাজ-মন চিহ্নিত হয়; পৌরাণিক যুগের সমাজ-মনের সঙ্গে বর্তমান যুগের সমাজ-মনের পার্থক্য তাই অনিবার্য। পুরাণের মধ্যেও কাহিনী আছে, উপন্যাসের মধ্যেও কাহিনী আছে,—কিন্তু উভয়ের আবেদন এক নয়। আধুনিক পাঠক উপন্যাস পড়ে যে আনন্দ পায়, পুবাণ পড়ে যদি সেই আনন্দ না পায়, তাহলে তার জন্য ক্ষুব্ধ হওয়া উচিত নয়। 'চলচ্চিত্রেব ছায়াপটে বিকৃত প্রতীচ্য প্রেমের রোমন্থনের দৃশ্য না দেখিয়া যদি আমাদের পুত্রকন্যারা পুনরায় পুরাণ-কথার আস্বাদ লইতে উৎসাহিত হন—প্রগতি সাহিত্যের নিপুণ চিত্ত-ব্যবচ্ছেদের বিক্ষেপকব কাহিনী ফেলিয়া রাখিয়া সীতা-সাবিত্রী, অরুন্ধতী-লোপমুদ্রা, ভীষ্ম-একলব্যের ত্যাগ-পবিত্র জীবন-গীতায় মনোনিবেশ করেন, তবেই দেশেব বাতাস আবার ফিরিবে', --খুব সত্য কথা। কিন্তু ইচ্ছা করলেও আজ আর পুবাণের জগতে ফিরে যেতে পারবো না, 'সে ভাষা ভুলিয়া গেছি,—নাম দোঁহাকার'; মধ্যে বহু রজনীর গাঢ় অন্ধকার, এই ব্যবধান অনতিক্রম্য।

আমাদের দেশে পুরাণ-কথার প্রচলন বহু-ব্যাপ্ত। য়োরোপেও পৌরাণিক কাহিনী জনপ্রিয়। তবে দু'দেশের পুরাণের পার্থক্য অত্যন্ত স্পষ্ট; য়োরোপে পুবাণের জন্ম 'পেগান'গ্রীসে, আমাদের পুরাণ হিন্দু ধর্মের ভক্তিবাদ প্রেরিত। অবশ্যই মহাভারত-পুরাণে এমন অনেক বিচ্ছিন্ন কাহিনী পাওয়া যাবে, যার সঙ্গে ধর্ম-বিশ্বাসের প্রত্যক্ষ যোগ নেই, তবু ভারতবর্ষে, বিশেষ করে বাংলাদেশে, মধ্যযুগে এবং আবার উনবিংশ শতাব্দীর শেষপাদে সাহিত্যের সর্বক্ষেত্রে পৌরাণিক কাহিনীর যে অতিবিস্তার লক্ষ্য করি, তার মধ্যে ভক্তিরসের স্বতঃপ্লাবন অনিবার্য

বলে মনে হয়। য়োরোপে 'মিথ'-এর সঙ্গে ভক্তিভাবের কোন প্রত্যক্ষ যোগ নেই, বিশেষতঃ আধুনিক যুগে প্রাচীন 'মিথ'-এর জীবনরস-রসিকতা পুনরায় আবিষ্কার করা হচ্ছে য়োরোপে, এবং সৃষ্টি হচ্ছে পুরাণাশ্রয়ী আধুনিক সাহিত্য। কিন্তু বাংলা সাহিত্যে পৌরাণিক কাব্য-নাটকের নিদর্শন নবীনচন্দ্র-রাজকৃষ্ণ-গিরিশচন্দ্র-ক্ষীরোদপ্রসাদের রচনা, অর্দ্ধশতাব্দীর ব্যবধানেই যে সাহিত্যকর্মের আবেদন বর্তমান পাঠক-সমাজের কাছে ক্ষীণ-হয়ে এসেছে। কৃত্তিবাসী রামায়ণ, দাশরথী রায়ের পাঁচালী, এমনকি গিরিশচন্দ্রের পৌরাণিক নাটকও আজ দূরকালেব সামগ্রী বলে মনে হয়; বিংশ শতাব্দীর প্রথম থেকেই একটা নূতন যুগের সৃষ্টি হয়েছে।[২]

তাকে রবীন্দ্রযুগ বলতে পারি, কারণ 'যে-বাঙালীর বয়স এখনও পঞ্চাশের নীচে, তার মতিগতি প্রধানত রবীন্দ্র-প্রভাবিত; এবং যাঁরা তদূর্ধ্বে উঠেছেন, বিবেচক হলে, তাঁরাও মানতে বাধ্য যে বাংলার আধুনিক সংস্কৃতি একা রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি।'[৩] রবীন্দ্রসাহিত্যের বহুতর পরিচয়ের মধ্যে প্রধানতম হলো তার রোমান্টিক কাব্য-লক্ষণ; এবং বর্তমানে আমরা রোমান্টিক যুগে বাস করি, একথা বললে ভুল হবে না। অন্যদিকে রোমান্টিক যুগ বহিরঙ্গ পরিচয়ে প্রাচীন-বিরোধী হয়েও, অন্তরঙ্গ পরিচয়ে ধ্রুপদী সাহিত্যের রসপুষ্ট। য়োরোপে রোমান্টিক যুগে 'In fact, the new thought and literature did not turn away from Greek and Latin. It is impossible to believe that the movement which produced Shelley's *Prometheus Unbound*, Keats's *Ode on a Grecian Urn*, Goethe's *Roman Elegies*, Chateaubriand's *The Martyrs* and the tragedies of Alfieri was anti-classical'.[৪] বলা-বাহুল্য, রোমান্টিক কবির সৌন্দর্যপিপাসা, প্রেমাদর্শ, এবং স্বাধীনতার আকূতি বর্তমান খণ্ড-সংকীর্ণ অভিজ্ঞতার জগতে পরিপূর্ণতা খুঁজে পায়নি, তাকে দূর অতীতের পুরাণ-কাহিনীর মধ্যে আরেকটি জগৎ

গড়ে নিতে হয়েছে। রোমান্টিক কবির কাব্যে পুরাণ-কাহিনী ফিরে এলো বটে, কিন্তু ঠিক তার স্বকীয় রূপে নয়, রোমান্টিক-বাসনার নূতন পরিধানে, নূতনতর জীবন-তাৎপর্যে। রোমান্টিক যুগে 'they were reinterpreted: they were re-read with a different emphasis and deeper understanding.'[৫] (শেলী এস্কিলাস থেকে কাহিনী নিলেন বটে, কিন্তু 'প্রমিথিয়ুস আনবাউণ্ড' বিশেষ-ভাবেই শেলীর সৃষ্টি অথবা রোমান্টিক যুগের সৃষ্টি। গ্রীক্‌দেব কাছে যে কাহিনী ছিল জীবনের প্রতিরূপ, আধুনিক কবিব কাছে তা জীবনের রূপক; আধুনিক কবি প্রায়শই নিজ বক্তব্য, নিজ জীবন-দর্শন প্রকাশেব উপায় রূপে পুবাণ-কাহিনী গ্রহণ করলেন, ফলে পুবাণ-কাহিনীব তাৎপর্য বদলে গেল,[৬] ঘটলো 'পুবাণের নবজন্ম'।)

পুবাণের নবজন্ম দু'ভাবে ঘটতে পাবে। "পুরাতনেব নূতন ভাষ্য রচনা কবিয়া মানুষের মন তৃপ্তি পাইতে পারে। হোমারেব অডিসি কাব্যেব নায়ক সমুদ্রবক্ষে বিচিত্র অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিল। টেনিসন তাঁহাব ইউলিসিস্‌ কবিতাটিতে ইউলিসিসের অভিজ্ঞতাকে নূতন ভাষ্যে সঞ্জীবিত কবিয়া আধুনিক মনের কাছে হৃদ্য কবিয়া তুলিয়াছেন। হোমাবেব 'তন্ময় জগৎ' টেনিসনের হাতে 'মন্ময় জগৎ' হইয়া উঠিয়াছে। হোমারের অডিসিতে মহত্ব, টেনিসনের ইউলিসিসে নৈকট্য; হোমারেব পাত্রে সার্বজনীন সুধা, টেনিসনেব পাত্রে আধুনিক মনের সুধা; হোমারের কাব্য ভাবীকালকে আনন্দ দান করিবে, টেনিসনের কবিতাটি পরবর্তী কালের হৃদ্য মনে না হইতেও পারে। আর একরকমের প্রাচীন সাহিত্য আধুনিক তৃষ্ণার পানীয় জোগাইতে পারে। নূতন ভাষ্য রচনা করিয়া নয়, নূতন যুগের উপযোগী পরিবর্তন সাধন করিয়া। পৃথিবীর সাহিত্যে সর্বকালেই এমন ঘটিয়াছে, এখনো ঘটিতেছে। ইহাকে বলা যাইতে পারে, প্রাচীনের নবীকরণ। টেনিসন কাহিনীকে অবিকৃত রাখিয়া নূতন ভাষ্যের দ্বারা আধুনিক মনের আসন রচনা করিয়াছেন। কিন্তু অনেক লেখক

প্রাচীন সাহিত্যের উপরে হস্তক্ষেপ করেন। কাহিনী অংশের অদল বদল করেন, নূতন তথ্য সংযোজিত করেন, এবং নূতন ভাষ্য ও নূতন প্রাণে সঞ্জীবিত করিয়া তাহাকে নূতন যুগের নাগরিক অধিকার প্রদান করিয়া দূরবর্তী মহত্বকে আধুনিক মনের নিকটে আনিয়া দেন।"[৭]

রোমান্টিক কবিরা কাহিনীর পরিবর্তন কমই করেছেন। কাহিনীকে অবিকৃত রেখে তাকে নূতন যুগের উপযোগী করে তুলেছেন। রবীন্দ্রনাথের কচ ও দেবযানী, দুর্যোধন, ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী এবং কর্ণ পৌরাণিক চরিত্র সন্দেহ নেই, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কবিতায় তাঁরা আধুনিক মানুষ। আধুনিক মানুষের মনের জটিলতা এবং স্ববিরোধ, আদর্শবাদ এবং ব্যর্থতা, উল্লাস এবং যন্ত্রণা রবীন্দ্র-পৌরাণিক সাহিত্যে আমরা আবিষ্কার করি; অথবা বলা ভালো, রবীন্দ্রনাথ পুরাণ-কাহিনীর ঘন অরণ্য থেকে আধুনিক-সম্ভাবনাযুক্ত কয়েকটি চরিত্রকে আবিষ্কার করেছেন; রবীন্দ্রনাথ এখানে শুধু স্রষ্টা নন, তিনি আবিষ্কর্তাও বটে।

'গান্ধারীর আবেদন' কাব্যনাট্যে ধৃতরাষ্ট্র কিংবা দুর্যোধন চরিত্রে কোনো পরিবর্তন নেই, কিন্তু তবু রবীন্দ্রনাথের ধৃতরাষ্ট্র-দুর্যোধনকে পৌরাণিক চরিত্র বলা শক্ত। মহাভারতের একরৈখিক ও একরঙা চরিত্র রবীন্দ্রনাথের কবিতায় বহু রেখায় ও রঙে উজ্জ্বলতর হয়ে উঠেছে; পুরাণে যারা সরল চরিত্র, রবীন্দ্রনাথ তাঁদের মধ্যে জটিল ব্যক্তিত্ব আবিষ্কার করলেন। রবীন্দ্রনাথের দুর্যোধন তাই পারিভাষিক অভিধায় 'দুর্বৃত্ত চরিত্র' হওয়া সত্ত্বেও আমাদের আকৃষ্ট করে তার শৌর্য, আত্মবিশ্বাস ও আত্মমর্যাদা বোধের দ্বারা; রবীন্দ্রনাথের ধৃতরাষ্ট্র শুধু স্নেহ দুর্বল পিতা নন,—দ্বিধা জর্জর যন্ত্রণা কাতর, ট্রাজিডির নায়ক। 'বিদায় অভিশাপ' কাব্যনাট্যে অবশ্য কাহিনীগত পরিবর্তন ঘটেছে; দেবযানীর অভিশাপের প্রত্যুত্তরে কচের আশীর্বাণী মহাভারতীয় নয়। কিন্তু কাহিনীগত পরিবর্তনের মধ্যেই কচ

চরিত্রের নূতনত্ব নয়; রবীন্দ্রনাথের কচ দেবযানীকে ভালোবাসে, এবং কর্তব্য ও ভালোবাসার দ্বন্দ্বে বিদীর্ণ-হৃদয়। এই অন্তর্দ্বন্দ্ব রবীন্দ্রনাথের আবিষ্কার:

'ভালোবাসি কিনা আজ
সে তর্কে কী ফল। আমার যা আছে কাজ
সে আমি সাধিব। স্বর্গ আর স্বর্গ বলে
যদি মনে নাহি লাগে, দূর বনতলে
যদি ঘুরে মরে চিত্ত, বিদ্ধ মৃগসম,
চিরতৃষ্ণা লেগে থাকে দগ্ধ প্রাণে মম
সর্ব কার্য মাঝে—তবু চলে যেতে হবে
সুখ শূন্য সেই স্বর্গ ধামে।'

হয়তো শেলীর মতই রবীন্দ্রনাথও পৌরাণিক চরিত্রকে নিজ বক্তব্য প্রকাশের বাহন হিসাবেই গ্রহণ করেছেন, রবীন্দ্রনাথের মৌলিক সৃষ্টির মতই পৌরাণিক সৃষ্টিও আসলে 'vehicles of ideas'; স্নেহ ও কর্তব্যের সংঘাত, সামাজিক মূল্যবোধ ও মানসিক মূল্যবোধের বিরোধ 'গান্ধারীর আবেদন', 'কর্ণ-কুন্তী সংবাদ', 'বিদায় অভিশাপ', 'নরকবাস' প্রভৃতি সবগুলি রচনারই মূল বিষয়।

২.

বিশ শতকের প্রথম তিন দশকের কবিরা রবীন্দ্রনাথের দ্বারা নানাভাবে প্রভাবিত হলেও, পৌরাণিক বিষয়কে আশ্রয় করে কবিতা খুব কমই লিখেছেন। 'ভারতীযুগে'র কবিদের উপর এ ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথের কোনো সাধারণ প্রভাব পড়ে নি। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পাদের পৌরাণিক নাট্যধারা তখনও জনপ্রিয়তা হারায়নি, কিন্তু গিরিশচন্দ্রের ভক্তিসর্বস্ব পৌরাণিক নাটকের পরিবর্তে দ্বিজেন্দ্রলাল ও ক্ষীরোদপ্রসাদের নূতন ধরণের পৌরাণিক নাটক ক্রমশঃ অধিক প্রসার লাভ করতে থাকে। ক্ষীরোদপ্রসাদের 'নরনারায়ণ' (১৯২৭) দৈবী মহিমাকে স্বীকার করেও কর্ণ-চরিত্রের নবভাষ্য রচনা করলো

এবং রবীন্দ্রনাথের 'কর্ণ কুন্তী সংবাদে'র প্রভাব এক্ষেত্রে সহজ-লক্ষ্য। দ্বিজেন্দ্রলালের পৌরাণিক নাটক একান্তভাবেই নব-মানবতাবাদ প্রেরিত; দ্বিজেন্দ্রলাল 'সিদ্ধরস'-এর ব্যত্যয় ঘটিয়ে সীতা, ভীষ্ম এবং অহল্যা চরিত্রের নবরূপ দান করলেন। কোনো সন্দেহ নেই, গিরিশচন্দ্রের পৌরাণিক নাটকের তুলনায় দ্বিজেন্দ্রলালের পৌরাণিক নাটক আদৌ জনসমর্থন লাভ করে নি; দ্বিজেন্দ্রলালের এই নাটকগুলির মঞ্চসাফল্যও নগণ্য। তবু শিক্ষিত বাঙালী সমাজে রবীন্দ্রনাথের অলক্ষ্য প্রভাব ক্রমশঃ বিস্তার লাভ করছিল। পৌরাণিক কাহিনীর নূতন তাৎপর্য লাভ পূর্ববর্তী যুগে যেভাবে কঠোর সমালোচনা লাভ করেছে, এ যুগে তার কিছু ব্যতিক্রম দেখা গেল। যতীন্দ্রমোহন বাগ্চীর 'মহাভারতী' কাব্যগ্রন্থের পটভূমিতে এই যুগপরিচয় নিহিত আছে।

তবু, 'মহাভারতী'কাব্য যুগ প্রেরণায় রচিত এ কথা বলি না। তাহলে অন্যান্য কবিরা পৌরাণিক কাহিনী নিয়ে কবিতা লিখলেন না কেন? সত্যেন্দ্রনাথের পুরাণ-জ্ঞান সম্ভবতঃ যতীন্দ্রমোহনের থেকে অনেক বেশী ছিল, কিন্তু 'তার বদলে পেলুম' 'মহাসরস্বতী' কবিতা; যেখানে অনেক তথ্যের সমাবেশ আছে, পুরাণ-নৈকট্যও হয়তো স্বীকার্য, 'কিন্তু সে বন্দনার মধ্যে প্রাণের বিস্ময়ভাব অল্প। পণ্ডিত লেখকের মস্তিষ্কে জায়গা পেয়ে কবির আরাধ্যা মহাসরস্বতী ক্রমশঃ এই সব কথা শুনেছেন—

সিন্ধু হতে বিন্দু উঠে বাষ্পরূপে বিদ্যুৎ-সম্বল,—
বিন্দু-বিসর্গের দিনে তুমি তারে কর গো প্রবল।
তুমি কর অকুণ্ঠিত ভার্গবের ভীষণ কুঠার;
গোত্রমাতা মুদ্গলানী ঋগ্বেদ ব্যাখ্যানে বীর্য যার,—
ইষ্ট তুমি তার।

এ শুধু ইটের পরে ইট! এতে তাজমহলের ঐশ্বর্যও নেই, পল্লী-কুটীরের স্নিগ্ধতাও নেই।'[৮] করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় গ্রীক্ পুরাণের

কাহিনী নিয়ে লিখলেন 'অরফিউস্ ও ইউরিডিস্' ; কিন্তু বাঙালী কবির স্বভাব-তত্ত্বমুখিতার ফলে, না পেলুম গ্রীক্ পুরাণের জীবন রসরসিকতা, না পেলুম তার নবতর কাব্য-ব্যাখ্যা :

'কেন তারই মত ঝুরে অবিরত লক্ষ লক্ষ নারী ও নর ?
দুখে-ভরা সুখ-ভোগ লাগি তৃখ্ ক্ষ্যাপাইছে যুগ যুগান্তর ?
এই শৃঙ্খলা, ছন্দোমেখলা, একি অ-কারণ ? মূল্যহীন ?
পুণ্য-পাপের চলে নাকি জের ? মরণ-বাঁচন দৈবাধীন ?' [৯]

কালিদাস রায়ের বৈদিক দেবতা-স্তোত্রগুলিও (আদিত্য, বরুণ, বৈশ্বানর, সোম, ইন্দ্র,) এই একই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।

পুরাণের কাহিনীকে জীবন্ত করে তোলা এবং তার মধ্যে আধুনিক জীবন-বোধকে সঞ্চারিত করা সহজ নয় ; যতীন্দ্রমোহন এই দুরূহ কবি-কর্মে যে অসামান্য সাফল্য অর্জন করেছেন তা সে যুগে এবং সম্ভবতঃ এ যুগেও বিরল ব্যতিক্রম। কর্ণ, দুর্যোধন, ভীম মহাভারতের চরিত্র ; শবরীর প্রতীক্ষার কাহিনী রামায়ণ থেকে গৃহীত।

একমাত্র 'শবরীর প্রতীক্ষা' কবিতাতেই সিদ্ধরসের হানি ঘটেছে। রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডে শবরীর কাহিনী বর্ণিত আছে। পুরাণের কাহিনী অনুসারে 'এক সময় ইনি রামায়ণ-বর্ণিত পম্পা তীরে মতঙ্গ ঋষির আশ্রমে মুনিদের পরিচারিকা ছিলেন। তপস্বীরা শবরীকে আশ্বাস দিয়েছিলেন, রাম এই আশ্রমে এলে তাঁকে দর্শন করে শবরী এমন স্থানে যাবেন যেখান হতে কেহই আর ফিরে আসে না। সেই দিন হতে শবরী রামের আগমন প্রতীক্ষা করে রইলেন। রামের জন্য শবরী প্রত্যহ বন্য ফল সংগ্রহ করে রাখতেন। অবশেষে একদিন রামচন্দ্র যখন অপহৃতা সীতার অন্বেষণে সেখানে উপস্থিত হলেন, তখন শবরী করজোড়ে দণ্ডায়মান হয়ে রামের চরণে পতিত হলেন। রামের প্রশ্নের উত্তরে শবরী বলেন—রামের শুভ আগমনে তাঁর তপস্যার সমাপ্তি হলো, তাঁর জন্ম সার্থক এবং গুরুসেবা সফল হলো। এবারে

তিনি দেবলোক-প্রাপ্ত হবেন। এইরূপে রামের সেবা করে জটাবতী চীর-অজিন-ধারিণী শবরী অগ্নিতে দেহ আহুতি দিয়ে স্বর্গলোকে গমন করলেন।’[১০] যতীন্দ্রমোহন এই কাহিনীকে বর্ণনা ও নাট্যরূপের মধ্য দিয়ে আধুনিক পাঠকের কাছে উপস্থিত করেছেন ; কাহিনীভাগে তিনি সামান্যতম পরিবর্তনও ঘটাননি। কিন্তু পুরাণের নবজন্ম ঘটলো নবমানবতার স্পর্শে, রামচন্দ্রের স্পর্শ লাভের পূর্বেই শবরীর ‘পতিতা’ এবং ‘অনার্য’ পরিচয় পাঠক বিস্মৃত হয়, মানবী রূপেই শবরীর অসীম প্রতীক্ষা ও তীব্র বেদনা অনুভববেদ্য হয়ে ওঠে। পুরাণের শবরী অস্পষ্ট ছায়ালোকের অধিবাসিনী, ‘মহাভারতী’র শবরী মর্ত্যলোকের হৃদয় বাসনায় পরিপূর্ণ একটি নারী। রামচন্দ্রের জন্য তার প্রতীক্ষা সূচনায় ছিল ‘সত্যের প্রতীক্ষা’ (মতঙ্গের উক্তি : ‘সত্যের প্রতীক্ষা কর জীবনের অনুভূতি মাঝে / নিষ্ঠায় বাঁধিয়া বক্ষ।’) ; কিন্তু সত্যের প্রতীক্ষাই যখন প্রিয়তমের জন্য প্রতীক্ষায় রূপান্তরিত হয়েছে তখনই পৌরাণিক চরিত্রের নবতর তাৎপর্য লাভ ঘটেছে। তখন চিরকালের প্রেমিকার মতই ‘শয্যা রচি কুসুম পল্লবে/যাপে দীর্ঘ বিভাবরী পথ, চেয়ে, বাঞ্ছিত বল্লভে!’ এবং ‘রামচন্দ্রহীন রাত্রি ঘন হয়ে ঘিরে তপোবনে,— / নিশি জাগরণ মসী আঁকি শুধু কলঙ্কী নয়নে!’ (তুঃ—রজনি-জনিত-গুরু-জাগর-রাগকষায়িত মলসনিমেষং।) শবরীর এই বর্ণনা বিরহকাতরা নারীর বর্ণনা। যেখানে ‘সিদ্ধরসে’র ব্যত্যয়, অর্থাৎ রামচন্দ্রের উক্তিতে —‘এই তো এসেছি আমি ; কোথা তুমি শবরী সুন্দরী, / কে বলে পতিতা তুমি ? তুমি মোর মর্ম—সহচরী !’,—সেখানেও কবির উদ্দেশ্য বুঝতে কষ্ট হয় না। ‘পাষাণী’ নাটকে দ্বিজেন্দ্রলাল এই একই উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে ‘সিদ্ধরসের’ ব্যত্যয় ঘটিয়েছিলেন। হয়তো রামচন্দ্রের মুখে শবরীর প্রতি ‘মর্মসহচরী’ সম্বোধনটি শুনতে আমরা প্রস্তুত ছিলুম না, কিন্তু এই রচনায় রামচন্দ্র উপলক্ষ্য মাত্র, রামচন্দ্রের মাহাত্ম্য বর্ণনায় কবির প্রয়োজন নেই। রামচন্দ্র শবরী চরিত্রকেই উজ্জ্বলতর করে তুলতে সাহায্য করেছে।)

'ভীম' কবিতাটি তুলনায় দুর্বল রচনা, পৌরাণিক কাহিনীর অনুসরণে এখানে ভীমের মহিমা প্রচুর উচ্ছ্বাসের সঙ্গে বর্ণনা করা হয়েছে। তবে মহাভারতে ভীমের চরিত্র-গৌরব স্বীকৃত হলেও, তার স্বাতন্ত্র্য স্পষ্টতর হয় নি। তাছাড়া ভীমের আচরণ অনেক সময়েই ভীতি কিংবা কৌতুকের উপাদান, চরিত্রটি যুধিষ্ঠির বা অর্জুনের তুলনায় অনুজ্জ্বল। গিরিশচন্দ্রের 'পাণ্ডব গৌরব' নাটকে আমরা প্রথম ভীমের মহিমোজ্জ্বল চরিত্রের প্রকাশ লক্ষ্য করি। ভীম চরিত্র সম্বন্ধে আমাদের সংস্কার যেন তখন থেকেই পরিবর্তিত হতে সুরু করে, যতীন্দ্রমোহন এই পবিবর্তনকে সম্পূর্ণতা দিলেন। যতীন্দ্রমোহনের ভীম শুধু সাহসী বীব নয়, সত্যনিষ্ঠ আত্মপ্রত্যয়ী নয়,—তার মধ্যে আমরা দেখলুম :

অকৃত্রিম প্রেম যেথা, টলিয়াছে অটল হৃদয় ,—
ভুলিয়াছ আভিজাত্য ; বেদনাকে দিয়াছ আশ্রয়
অক্ষুণ্ণ অন্তব-ধর্মে ;—রাক্ষসীর ব্যগ্র আলিঙ্গনে
সাগ্রহে দিয়াছ ধরা , আশ্রিতের আর্ত আবেদনে
অকুণ্ঠিত ক্ষাত্রবীর্যে সঁপিয়াছ আত্ম-প্রতিদান—
কেবা উচ্চ, কেবা নীচ —গণনি সমান-অসমান।

হৃদয়ধর্মেব সংযোগেই মহাভারতের এই বিরাট চরিত্রটি আধুনিক মানুষেব সমধর্মা হয়ে উঠলো ; প্রেমই তাকে দিল স্বাতন্ত্র্য, বীরত্বের জয়টীকার সঙ্গে দুর্গম বন্ধুর জীবনের পথে চলার শক্তি।

'কর্ণ' এবং 'দুর্যোধন' যতীন্দ্রমোহনের সমগ্র কাব্য-রচনাবলীর মধ্যে উজ্জ্বলতম সৃষ্টি। জীবন সংরাগেব তীব্রতায়, জটিল ব্যক্তিত্বের রূপায়ণে, চিত্রকল্পের যথার্থতায় এর সমতুল্য কবিতা বাংলা ভাষায় কমই লেখা হয়েছে। কর্ণ এবং দুর্যোধন একান্তভাবেই যতীন্দ্রমোহনের 'রচনা' ; সৃষ্ট চরিত্রের সঙ্গে স্রষ্টার অভিন্নতা ছাড়া এ জাতীয় চরিত্র সৃষ্টি হতে পারে না। অথচ মহাভারতীয় কাহিনীর কোনো পরিবর্তন ঘটাননি যতীন্দ্রমোহন। মহাভারতীয় কাহিনীর আধারে নবযুগের জীবন-রস পরিবেষিত হয়েছে কবিতা দুটিতে। মূল উদ্দেশ্য অবশ্যই

কর্ণ এবং দুর্যোধনের গৌরব ঘোষণা,—কিন্তু আধুনিক-কবি পৌরাণিক চরিত্রের যে রসরূপ দান করলেন 'মহাকবির কল্পনাতে ছিল না তার ছবি।'

কর্ণ ভাগ্যবিড়ম্বিত বীর। শৌর্যে-বীর্যে, ক্ষমায়-দানে, পৌরুষে-আত্মবিশ্বাসে আকাশচুম্বী চরিত্র। ক্ষত্রিয় সন্তান হয়েও আত্মপরিচয়ে বঞ্চিত। এই জন্মলাঞ্ছনাই কর্ণের জীবনের সবচেয়ে বড়ো দুগ্র্হ। কর্ণ সমগ্র জীবন চেয়েছেন প্রতিষ্ঠিত হতে, জন সমক্ষে স্বীকৃতিলাভ করতে। কিন্তু পেয়েছেন অবমাননা ও লাঞ্ছনা। প্রবল শক্তিশালী হয়েও এই অবিচার মাথা পেতে নিতে হয়েছে--সূত পরিচয়ের জন্য। এবং এইজন্যই সূত পরিচয়ের অভিমানকে কর্ণ আরও বেশী আঁকড়ে ধরেছেন : 'ভাগ্যনিহত সূতপুত্রের বীর্যের অভিমান'ই তাঁর একমাত্র অবলম্বন। দুর্যোধন অন্যায়কারী,—কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে তাঁর পরাজয় সুনিশ্চিত ; তবু এই দুর্যোধনই কর্ণকে অঙ্গরাজ্যে অভিষিক্ত করেছেন, বন্ধুত্বদান করেছেন ; ফলে দুর্যোধনের কাছে কর্ণকে আমৃত্যু ঋণী থাকতে হয়েছে। যে কাজ তিনি করতে চাননি, তাঁকে সে কাজও করতে হয়েছে, যে কর্মফল তাঁর প্রাপ্য ছিল না, তাও গ্রহণ করতে তিনি বাধ্য হয়েছেন। সমগ্র জীবনব্যাপী এই বঞ্চনাব বিরুদ্ধেই কর্ণের সংগ্রাম, সহায় পুরুষকার, তথা বীরধর্ম।

এই পর্যন্ত 'মহাভারতী' ভারত-কথারই অনুসরণ। কাহিনীগত পরিবর্তন যৎসামান্য, যেমন নাটকের প্রয়োজনে ঘটনাক্রমের স্থান পরিবর্তন। এখানে যুদ্ধযাত্রার পূর্বদিন কর্ণ মাতা কুন্তীর কাছ থেকে জন্ম পরিচয় জেনেছেন, এবং যুদ্ধযাত্রা কালে, রথারোহণের পূর্বে কবচকুণ্ডল হারিয়েছেন। এই দুটি ঘটনাই মহাভারতীয় কাহিনী-ধারায় বহু পূর্বে স্থাপিত। নাটকীয় মুহূর্তের ভাবৈক্য সৃষ্টির প্রয়োজনে যতীন্দ্রমোহন এই ঘটনাগুলিকে কর্ণের শেষযুদ্ধের সন্নিকটবর্তী করেছেন। কর্ণের একটি উক্তিও মূল কাহিনীর সঙ্গে কিছু দূরত্ব সৃষ্টি করেছে ; বলাবাহুল্য ঘটনাক্রমের ব্যতিক্রমে 'কর্ণকুন্তীসংবাদে'র

আংশিক সমর্থন থাকলেও, এই ব্যাপারটি যতীন্দ্রমোহনের সম্পূর্ণ মৌলিক যোজনা। কর্ণ বারবার বলছেন যে মাতা, 'পার্থের প্রাণভিক্ষা মাগিল জোড়করি দুটি কর, —'এবং 'মাতা হয়ে সুতে ভিক্ষা মাগিল পড়িয়া চরণ তলে।' মহাভারতে উদ্যোগপর্বে (ভগবদ্‌যান পর্বধ্যায়) কুন্তী কর্ণকে বলেছিলেন : 'বৎস! তুমি কুন্তী নন্দন, রাধাগর্ভসম্ভূত নও; অধিরথও তোমার পিতা নন, সূতকুলে তোমার জন্ম হয় নাই'। ....তুমি আমার পিতার গৃহে আমার গর্ভে জন্মগ্রহণপূর্বক মোহ-বশতঃ স্বীয় ভ্রাতৃগণের সহিত সৌহার্দ না করিয়া এক্ষণে যে দুর্যোধনের সেবা করিতেছ, ইহা কি তোমার সমুচিত কার্য? মহাত্মগণ ধর্ম বিনিশ্চয় বিষয়ে পিতা মাতাকে সন্তুষ্ট করা পুত্রের প্রধান ধর্ম বলিয়া কীর্তন করিয়াছেন; মহাবীর ধনঞ্জয় পূর্বে যুধিষ্ঠিরের নিমিত্ত যে সম্পত্তি আহরণ করিয়াছিলেন, দুর্যোধন প্রভৃতি দুরাত্মগণ ছলপূর্বক তাহা অপহরণ করিয়াছে; এক্ষণে তুমি ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণের নিকট হইতে উহা গ্রহণ পূর্বক স্বচ্ছন্দে ভোগ কর। আজি কৌরব সকল কর্ণার্জুনেব সমাগম অবলোকন করুন ও দুরাত্মগণ তোমাদের সৌভ্রাত্র সন্দর্শন করিয়া অবনত হউক।... ...তুমি সর্বগুণ সম্পন্ন। সর্বশ্রেষ্ঠ ভ্রাতৃগণের অগ্রজ ও পৃথাসূত; অতএব তোমার সূতপুত্র সংজ্ঞা তিরোহিত হওয়াই উচিত।'[১১] বলাবাহুল্য কুন্তীর এই উক্তির মধ্যে কোথাও অর্জুনের প্রাণভিক্ষার কথা নেই। রবীন্দ্রনাথ 'কর্ণকুন্তীসংবাদে', কুন্তীচরিত্রকে মাহাত্ম্য দানের অভিপ্রায়ে কুন্তীর উক্তিটিকে কর্ণের প্রতি অতৃপ্ত স্নেহ-বাৎসল্যের প্রকাশ রূপে ব্যাখ্যা করেছেন। যতীন্দ্রমোহন কর্ণ-চরিত্রকেই উজ্জ্বলতর করার উদ্দেশ্যে রবীন্দ্রনাথের এই ইঙ্গিত গ্রহণ না করে, মহাভারতে কুন্তীর প্রতি কর্ণের উক্তিটিকেই অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন : 'আমি আপনার বাক্যে আস্থা করি না; আপনার বাক্যা-নুরূপ কার্য করিলে আমার ধর্ম হানি হইবে।... ...আপনি পূর্বে মাতার ন্যায় আমার হিতচেষ্টা না করিয়া এক্ষণে স্বকীয় হিতবাসনায় আমাকে পুত্র বলিয়া সম্বোধন করিতেছেন।' সুতরাং যতীন্দ্রমোহন

যে মূল মহাভারতের কাহিনী ধারা থেকে সম্পূর্ণ বিচ্যুত হয়ে কুন্তী চরিত্রটিকে মলিন করেছেন, এমন বিবেচনা করা যায় না।

কর্ণই যতীন্দ্রমোহনের কবিতার নায়ক। কর্ণের মধ্যে যতীন্দ্রমোহন আবিষ্কার করেছেন তীব্র অন্তর্দ্বন্দ্ব; কুন্তীর সঙ্গে সাক্ষাতের পরই কর্ণের মনে দ্বিধা এবং দুর্বলতার প্রবেশ।

—হায় রে, বিধাতা, কি দারুণ লিপি লিখিলি কর্ণ-ভালে।
সুর-নরে কেবা কোথা পড়িয়াছে হেন সঙ্কট জালে?
একদিকে কাঁদে মায়ের মিনতি
আর দিকে বাঁধে বন্ধু বিনতি—

কর্ণ কেমন করে এই দ্বিধা-সংশয়কে অতিক্রম করবেন? তিনি ইষ্টদেবতা জবা সঙ্কাশদ্যুতি সবিতার কাছে প্রার্থনা জানিয়েছেন: 'এ আঁধারে শুধু পন্থা দেখাও',—'পুত্র হয়ে সে জননীর ঋণ শুধিবে কি বাহুবলে?' তারপর যখন তিনি কবচকুণ্ডল হারালেন, আগেই বুঝেছিলেন দৈব তাঁর প্রতি অপ্রসন্ন, এবার জানলেন 'স্বর্গে মর্তে যেথা অভিযোগ শক্তি সেখানে শুধু দুর্ভোগ অমোঘ ভাগ্য হাতে!—কর্ণের মুখে অদ্ভুত হাসি দেখা দিল অজ্ঞাতে!' অন্তরসংঘাতে ক্ষতবিক্ষত, দ্বিধায় কাতর, যন্ত্রণামথিত একটি চরিত্র, যতীন্দ্রমোহনের কর্ণ। একদিকে 'ধিক্কৃত কোন দৈব অতীত কর্ণ মানে না তার', অন্যদিকে দৈবের আঘাতে বিপর্যস্ত কর্ণ বলে ওঠেন:

—চালাও শল্য, ত্বরা লহ রথ—যেথা সে পার্থ আছে
শেষ প্রণিপাত লহ দিন নাথ আজি কর্ণের কাছে,
—সবই তো সমান—জয় পরাজয়—
অর্জুন-বধ—আত্ম-বিলয়।
—ভাগ্যের হাতে সবই অভিনয়—কর্ণ তা বুঝিয়াছে:
—চালাও শল্য—দ্রুত, দ্রুততর—পার্থ যেথায় আছে।

ট্রাজিক নায়ক কর্ণের এই 'শূন্য পরিণাম', নিয়তির নিষ্ঠুর চক্রান্তের কথা মনে পড়ায়; টম্সন্ সাহেব যে জন্য 'কর্ণকুন্তী

সংবাদে'র কর্ণকে গ্রীক্ ট্রাজিডির নায়ক একিহিলিসের সঙ্গে তুলনা করেছেন।

মহাভারতের কর্ণ চরিত্রের মধ্যেই হয়তো ট্রাজিডির নায়কের বীজ লুকিয়ে ছিল কিন্তু 'দুর্যোধন' যতীন্দ্রমোহনের মৌলিক কল্পনার নিদর্শন ; 'মহাভারতী'র শ্রেষ্ঠ চরিত্র। মহাভারতের দুর্যোধন অন্যায়কারী, দুর্যোধন ধিক্‌ত। রবীন্দ্রনাথের 'গান্ধারীর আবেদনে' দুর্যোধন ঈষৎ মর্যাদাপ্রাপ্ত, কিন্তু সেখানেও সে 'দুরাশয়' 'দুর্মতি' 'ভ্রাতৃদ্রোহী' 'লজ্জাহীন অহংকারী' এবং পিতা ধৃতরাষ্ট্র অন্তরে বাহিরে অন্ধ। যতীন্দ্র-মোহনের দুর্যোধন কোনো অন্যায় করেননি, বিরাট বীর্য-অপার শক্তির অধিকারী তিনি। '—রাজবংশের সম্ভ্রম চাহি / তবু কোনো তাপ নাহি এ মনে,—/ দুর্যোধনের মর্যাদাবোধ/ কে না জানে তার শত্রুজনে ?/ —ধর্ম তাহার—কর্ম তাহার/রাজ-রাজেন্দ্র-যোগ্য সবই,—/ মানী পেত মান, গুণী আহ্বান, ?/—অর্থী ফিরিত অর্থ লভি।' হয়তো এই চরিত্র মধুসূদনের রাবণ চরিত্রকে মনে পড়ায়। ট্রাজিডির নায়ক করেই যতীন্দ্রমোহন দুর্যোধনকে গড়েছেন ; (It is the nature of the tragic hero, at once his greatness and doom that he knows no shrinking or half-heartedness, but identifies himself wholly with the power that moves him and will admit the justification of no other power.'[১২])—মহাভারতের দুর্যোধনের মধ্যে এই 'tragic personality' ছিল না। 'মহাভারতী'তে দুর্যোধন অন্যায় করেও তাই যেন অন্যায়কারী নন, অথবা অন্যায়কারী হয়েও তাঁর প্রকট ব্যক্তিত্বের জন্য আমরা তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা এবং আকর্ষণ অনুভব করি। ধৃতরাষ্ট্রও তাই অন্তরে বাহিরে অন্ধ নন, আসলে 'পুত্রের পরে বিশ্বাসে তবু/ শ্রদ্ধানত সে উচ্চশির।' দুর্যোধন যখন বলেন : '—কাপুরুষতার শান্তি হইতে/ সংগ্রামও শ্রেয় নিত্যকাল', তখন 'প্যারাডাইস্ লস্টে'র স্যাটানের উক্তি মনে পড়ে : 'Better to reign in Hell than serve in

Heaven' এবং 'To be weak is miserable doing or Suffering.'

দুর্যোধন শেষ পর্যন্ত পরাজয় স্বীকার করেছেন ; কিন্তু এ পরাজয় দৈবাহত বীরের পরাজয়। অন্যায় যুদ্ধে ভীম তাঁকে পরাস্ত করেছে, আর তাই 'অধর্ম-রণে পরাজয় তবু করিব সবলে অস্বীকার।' একদিকে রাত্রির অন্ধকার নেমে আসছে কুরুক্ষেত্র প্রাঙ্গণে, অন্যদিকে দুর্যোধনের জীবন দীপও নির্বাপিত-প্রায়। অর্থহীন এই মৃত্যু ; ট্রাজিডির নায়কের সেই শেষ আত্মোপলব্ধি (দ্রঃ ম্যাকবেথের স্বগতোক্তি)। কিন্তু দুর্যোধন কোনো অনুশোচনা করেন না, কারণ তিনি জানেন, 'জয়-পরাজয়—প্রশ্ন সে নয়,/জানি, তা বীরের জীবনসাথী। / কোনো ক্ষোভ মোর নাহি এ জীবনে, /স্বভাব-রাজা এ দুর্যোধন,/নিন্দা-খ্যাতির ঊর্দ্ধে তাহার সর্বশাসন সিংহাসন।' আসলে এই 'দৃপ্তমহিমা'র জয়গান করাই যতীন্দ্রমোহনের উদ্দেশ্য, আর তাহলে বোধহয় ট্রাজিডি রচনা করারও যতীন্দ্রমোহনের কোনো অভিলাষ ছিল না।

পরম শূন্যতা, নিঃসীম অন্ধকার যতীন্দ্রমোহনের কাব্যের শেষ কথা নয়। তাঁর মধ্যে প্রশ্ন ছিল, যন্ত্রণা ছিল,—কর্ণ-দুর্যোধনের চরিত্রের তাই প্রেরণা। কিন্তু প্রশ্নের শেষে প্রত্যয়ের নিশ্চয়তা,—জীবনের অসম্পূর্ণ রূপ নয়, পরিপূর্ণ রূপই তাঁর অন্বিষ্ট। এবং কর্ণ ও দুর্যোধন চরিত্রে মানবতার জয়গানের মধ্যেই জীবনের স্বীকৃতি, পুরাণের চরিত্রের নবতর তাৎপর্যলাভ রবীন্দ্রযুগের কবি যতীন্দ্রমোহনের কাব্যে।

১। বিনায়ক সান্যাল : সাহিত্যসঙ্গমে (১৯৫১) পৃঃ ২৯৮।

২। 'পুরাণের নবজন্ম' হয়তো প্রথমে ঘটেছে মধুসূদনের কাব্যে, কিন্তু তাকে ব্যক্তিগত বিদ্রোহ বলাই উচিত। অন্যদিকে সেখানে পুরাণ কাহিনীর পরিবর্তনের দ্বারা পৌরাণিক চরিত্রের তাৎপর্য পরিবর্তিত হয়েছে। প্রমিথিয়ুস এবং আটালাণ্টার সঙ্গে তাই রাম-রাবণের পার্থক্য আছে। বর্তমান প্রবন্ধে যে সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনার সুযোগ নেই।

৩। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত : কুলায় ও কালপুরুষ (১৩৬৪) পৃ: ১৩।

৪। Gilbert Highet : The Classical Tradition (New York 1959) পৃ: ৩৫৪।

৫। ঐ

৬। 'There is a profound gulf between the Greek myth and Shelley's use of it. For the Greeks the ancient stories about which they wrote their incomparable poetry were not allegorical or symbolical but concerned with what they believed to be real persons, whether divine or human, existing in real world. ···But with Shelley it is different. His Prometheus is not a real person in whose individual existence he believes, but a figure who symbolizes a great abstract idea'. —C. M. Bowra : The Romantic Imagination London : 1961) পৃ : ১০৬।

৭। প্রমথনাথ বিশী : 'বাংলা সাহিত্যে ক্লাসিকাল রস'—ভারত প্রেমকথা ১৩৬২ পৃ: ।/০।

৮। হরপ্রসাদ মিত্র : কবিতার বিচিত্র কথা (১৯৫৭) পৃ: ৩৩৭।

৯। করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় : শতনরী (১৩৫৫) পৃ: ১৫৮।

১০। পৌরাণিক অভিধান—সুধীর সরকার সম্পাদিত (১৩৭০) পৃ: ৫০৩।

১১। কালীপ্রসন্ন সিংহ অনূদিত মহাভারত (হিতবাদী সং, ১৩১০) পৃ: ৫১৭।

১২। A. C. Bradley : Oxford Lectures on Poetry (London 1962) পৃ: ৭২।



দান্তে বা মিল্‌টনের সঙ্গে ওঅর্ডস্বার্থ বা শেলীর পার্থক্য সুস্পষ্ট। 'মেটাফিজিক্যাল পোয়েট' বলতে বুঝি, জীবন ও জগতের রহস্য আবিষ্কারে অতন্দ্র অধ্যবসায়ী কবি-দার্শনিক। 'রোমান্টিক কবি' অন্যদিকে অনুভবের স্বীকৃতিতে জীবন ও জগৎ কাব্যের ক্ষেত্রে অঙ্গীকার করেও তত্ত্বনিষ্ঠ নন। কিন্তু অনুভবের স্বীকৃতি দান্তে বা মিল্‌টনে নেই ? জীবন ও জগৎ সম্পর্কে একটি বিশিষ্ট ধারণা পোষণ করেন প্রত্যেক সৎ কবি। যুগকালগত পরিবেশ, কাব্যরীতি এবং মনোভঙ্গীই কবিতে কবিতে পার্থক্য সৃষ্টি করে। প্রশ্ন সব কবির মনেই আছে, সমাধানের ক্ষেত্রে কেবল স্বাতন্ত্র্য। কোনো কবি ধর্মের পথ অবলম্বন করেন, কোনো কবি জীবনের পথ, আবার কেউ কেউ পথহারা-লক্ষ্যহারা হয়ে অসীম নৈরাশ্যে নিমগ্ন হন। ব্লেকের প্রশ্ন এবং সমাধান : 'What', it will be Question'd, 'when the the Sun rises, do you not see a round disk of fire somewhat like a Guinea ?' O no, no, I see an Innumerable company of the Heavenly host crying, 'Holy, Holy, Holy is Lord God Almighty.' অন্যদিকে একালের স্টিফেন স্পেণ্ডারের জিজ্ঞাসা ও উত্তর : Who live under the shadow of a war,/what can I do that matters ? My pen stops, and my laughter, Dancing stop,/Or ride to a gap.[২] কিন্তু Expecting always/Some brightness to hold in trust/Some final innocence/Exempt from dust, / That hanging solid, / Would dangle through all / Like the created poem, / Or faceted crystal.[৩]

বাংলা কবিতার আলোচনায় রবীন্দ্র-প্রভাব বলতে সাধারণতঃ একটি বিশেষ জীবন-দর্শনের প্রভাব বোঝা হয়। রবীন্দ্রনাথের মনে উপনিষদের প্রেরণা, তাঁর ধর্মবোধ এবং মানবপ্রেম,—তাঁকে দিয়েছিল এক পরম প্রত্যয়, অনিঃশেষ আশাবাদ এবং সর্বমঙ্গলময়ত্বে বিশ্বাস। রবীন্দ্রনাথ খুব সহজেই বলেন: 'রাহুর মতন মৃত্যু/শুধু ফেলে ছায়া,/পারে না করিতে গ্রাস জীবনের স্বর্গীয় অমৃত / জড়ের কবলে / একথা নিশ্চিত মনে জানি।' কিংবা 'এ গলিতে বাস মোর তবু আমি জন্ম রোমান্টিক', কিংবা 'দুঃখ পেয়েছি, দৈন্য ঘিরেছে, অশ্লীল দিনে রাতে/দেখেছি কুশ্রীতারে ;/মানুষের প্রাণে বিষ মিশায়েছে মানুষ আপন হাতে ;/ঘটেছে তা বারে বারে। 'তবুতো বধির করেনি শ্রবণ কভু,/বেসুর ছাপায়ে কে দিয়েছে সুর আনি ;/পরুষ কলুষ ঝঞ্ঝায় শুনি তবু/চির দিবসের শান্ত শিবের বাণী।' এ থেকেই সমালোচক সিদ্ধান্ত করে বসেন যে, 'রবীন্দ্র-প্রভাব' শব্দের অর্থ, তাঁর সমকালীন বা পরবর্তী কবিদের 'আস্তিকতাবোধ, সৃষ্টি ও মঙ্গলে গভীর আস্থা, শান্তিতে বিশ্বাস।' লজিকের সূত্রানুসারে প্রমাণ করা হয়,—রবীন্দ্র কাব্যে আস্তিকতা ও কল্যাণবোধ আছে, বাংলা কাব্যে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব পড়েছে, সুতরাং আস্তিকতা ও কল্যাণবোধ বাংলা কাব্যে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব। এবং যে কবিতায় আস্তিকতার অভাব তারই নাম আধুনিক কাব্য।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর কবিতায় পরিবর্তন এসেছে, এবং 'The elusiveness of this faith and the persistent closeness of that despair make modern poetry the hazardous enterprise that it is.'[৪] বলাবাহুল্য এই পরিবর্তন য়োরোপে রবীন্দ্র-বিরোধিতার মধ্য দিয়ে সূচিত হয়নি, হয়তো রোমান্টিক কবি-কুলের বিশ্বাস এবং প্রত্যয়ের বিরুদ্ধাচরণ কিংবা যুগকালের অনিবার্য যন্ত্রণাবোধের প্রকাশ য়োরোপে আধুনিক কবিতার জন্ম দিয়েছে; সামাজিক এবং মানবিক মূল্যবোধের পরিবর্তনের একটি কারণ

মহাযুদ্ধ। কিন্তু সব কিছুই হারিয়ে যায় নি, য়েট্‌সের ঐতিহ্যানুসরণ কিংবা - সম্প্রতিকালেও পাস্তারনাকের সত্যোপলব্ধির প্রয়াস য়োরোপে অস্তিবোধকে সম্পূর্ণ লুপ্ত হতে দেয়নি।

অন্যদিকে আমাদের দেশেও রবীন্দ্র-পরবর্তী 'আধুনিক' কবিরা 'নাস্তিবোধ'কে সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করেননি। 'যে সময়ে সুধীন্দ্রনাথ তাঁর নাস্তিকতার নান্দীপাঠ আরম্ভ করলেন, ঠিক সেই সময়েই অমিয় চক্রবর্তীর মুখে বিশ্বাসের নতুন অঙ্গীকার শুনতে পেলাম আমরা— মেলাবেন তিনি ঝোড়ো হাওয়া আর পোড়ো বাড়িটার/ঐ ভাঙা দরজাটা/মেলাবেন।'[৭] কিংবা সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের বিপরীত সুরের কবিতাতেও প্রত্যয়ের অভাব নেই : 'একটি কবিতা লেখা হবে। তার জন্যে দেয়ালে দেয়ালে এঁটে দেয় কারা / অনাগত একদিনের ফতোয়া ;/মৃত্যুভয়কে ফাঁসিতে লটকে দিয়ে/মিছিল এগোয়/আকাশ বাতাস মুখরিত গানে,/গর্জনে তার/নখদর্পণে আঁকা/নতুন পৃথিবী অজস্র সুখ, সীমাহীন ভালোবাসা।'[৮] তাহলে কেমন করে বলি, অস্তি-বোধ একান্তই রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে পাওয়া পৈতৃক ধন, যা আধুনিক কালে উড়িয়ে দেওয়া-পুড়িয়ে দেওয়া কবিদের স্বভাব-ধর্ম। আসলে তা নয়। যুগধর্ম নাস্তিকতার পক্ষে একথা স্বীকার করি। কিন্তু কবির মনোজগতে উপলব্ধির সত্যতা যখনই প্রমাণিত হয়, তখন কবি ফিরে পান তাঁর অবলম্বন। আর যে কবির অবলম্বন আছে, তিনি দুঃখের গান গাইলেও দুঃখবাদী নন। যন্ত্রণার মধ্যেও তিনি পরম আনন্দকেই অনুভব করেন। এবং সেই তীব্র যন্ত্রণা, অপার বিষাদ কবিতাকে দেয় চিরন্তনতা, যা আধুনিক কালেও সম্ভব, যা চিরকালের সামগ্রী। তাই আধুনিক কাব্য-সমালোচকও দৃপ্তভঙ্গীতে ঘোষণা করেন : 'At heart all poetry is praise and celebration. Its joy is not mere pleasure, its lamentation not mere weeping, and its despair not mere despondencey. Whatever it does, it cannot but

confirm the existence of a meaningful world—even when it denounces its meaninglessness. Poetry means order, even with the indictment of chaos; it means hope, even with the outcry of despair.'[৭]

২.

তবে ঊনবিংশ শতাব্দীতে 'ঝড় তুফানের যুগে' বাংলা সাহিত্যে প্রশ্ন এবং প্রত্যয় যত স্পষ্ট এবং প্রত্যক্ষ, বর্তমান কালে তা অনেক পরিমাণে প্রচ্ছন্ন এবং সংশয়-কাতর। সংশয় বঙ্কিমচন্দ্রেরও ছিল, 'অতি তরুণ অবস্থা হইতে আমার মনে এই প্রশ্ন উদিত হইত—এ জীবন লইয়া কি করিব? লইয়া কি করিতে হয়? সমস্ত জীবন ইহার উত্তর খুঁজিয়াছি। উত্তর খুঁজিতে খুঁজিতে জীবন প্রায় কাটিয়া গিয়াছে।'[৮] কিন্তু সেই 'কমলাকান্তের দপ্তরে'র যুগেই, বঙ্কিমচন্দ্রের প্রত্যয় সুদৃঢ়ভাবে প্রকাশিত হয়েছে, 'মনুষ্য জাতির উপর যদি আমার প্রীতি থাকে, তবে আমি অন্য সুখ চাই না।' এবং 'এখন যেমন লোকে উন্মত্ত হইয়া ধন-মান-ভোগাদির প্রতি ধাবিত হয়, একদিন মনুষ্যজাতি সেইরূপ উন্মত্ত হইয়া পরের সুখের প্রতি ধাবমান হইবে। আমি মরিয়া ছাই হইব, কিন্তু আমার এ আশা একদিন ফলিবে।'[৯] বলাবাহুল্য এই একই বিশ্বাস রবীন্দ্রনাথের সমগ্র জীবনে রক্ষিত হয়েছে, পুষ্ট হয়েছে এবং জীবন-সায়াহ্নে অনেক হতাশার মধ্যেও ঘোষিত হয়েছে, 'মানুষের উপর বিশ্বাস হারানো পাপ, সে বিশ্বাস শেষ পর্যন্ত রক্ষা করব।...আর একদিন অপরাজিত মানুষ নিজের জয়যাত্রার অভিযানে সকল বাধা অতিক্রম করে অগ্রসর হবে তার মহৎ মর্যাদা ফিরে পাবার পথে। মনুষ্যত্বের অন্তহীন প্রতিকারহীন পরাভবকে চরম বলে বিশ্বাস করাকে আমি অপরাধ মনে করি।'[১০] ধর্মবিশ্বাস বঙ্কিমচন্দ্রেরও ছিল, রবীন্দ্রনাথেরও ছিল,—কিন্তু তাঁদের জীবন-প্রত্যয় ধর্মগ্রন্থ থেকে আহৃত নয়, এবং এইখানেই তথাকথিত 'রবীন্দ্রপ্রভাবিত' কবিদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পার্থক্য। কালিদাস রায় বলেন:

মনে হয় আমি আজি বড় অসহায়,
কোথা আশ্রয় ? কোথা আশ্বাস বাণী ?
অজ্ঞাতে সেই আজানা জনেরই পায়
নুয়ে পড়ে শির, জুড়ে যায় দুটি পাণি ॥[১১] (দিবাবসানে)

অথবা, করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতায় ঃ

দেয় স্মৃতি বড় দাগা, ভাল লাগা, মন্দ-লাগা হয়েছে সমান,
সহসা পেয়েছে টের অবসন্ন জীবনের শেষ দিনমান।
আর কেন ? আর নয়, পুরানো এ অভিনয়, খুলে দাও দ্বার ;
ডাকে সে অস্তিমডাকে, ঝরে পিঞ্জরের ফাঁকে রাঙা রক্ত-ধার।

ঐ শোনো গায় আহা—'সত্য যাহা পুণ্য তাহা'—পূর্ণ কলস্বর
উঠিছে উপর-পানে পশে কানে প্রাণে-প্রাণে প্রেমই ঈশ্বর।[১২]
(প্রবাসী)

এখানে বিশ্বাসই সবচেয়ে বড়ো কথা, যে বিশ্বাস এসেছে ভগবদ্‌ভক্তি এবং ভগবানের সর্বমঙ্গলময়ত্বে আস্থার মধ্য দিয়ে। এদিক থেকে এঁরা মধ্যযুগীয় বাঙালী কবিদের সঙ্গে মানস-সাযুজ্য অনুভব করেন। প্রকৃত প্রস্তাবে, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে এঁদের যোগ একান্ত আকস্মিক ও বহিরঙ্গগত, রবীন্দ্র-পূর্ব তথা প্রাক্-উনবিংশ বাংলা কাব্যধারার সঙ্গেই তাঁদের অন্তরঙ্গ যোগ।

জীবনের উপর বিশ্বাস এবং ভগবানের উপর বিশ্বাস হয়তো শেষ পর্যন্ত একই জায়গায় মিলে যায়। কিন্তু আমাদের বক্তব্য, 'সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই'—এই মধ্যযুগীয় মানব-প্রত্যয়ের সঙ্গে বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথের মানবতাবাদের পার্থক্য আছে। যাকে আমরা আজকের দিনে আধুনিক কবিতা বলি, যেমন অমিয় চক্রবর্তীর কবিতা, তাতে যে বিশ্বাসের প্রকাশ তা মধ্যযুগীয় বিশ্বাস নয়, তা রবীন্দ্র-বিশ্বাসের সমগোত্র। অবশ্য যে কথা বারবার বলেছি, তা আবার বলি, 'প্রভাব' শব্দটি কবির কাব্য বিচারে তাৎপর্যহীন ; আলোচ্য বিষয় কবি-মানসিকতা। কালিদাস রায়, কুমুদরঞ্জন মল্লিক,

করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়ের মানস-প্রকৃতির সঙ্গে অমিয় চক্রবর্তীর যে স্পষ্ট পার্থক্য, সেই একই পার্থক্য সূচিত হয় পূর্বোক্ত কবিদের সঙ্গে যতীন্দ্রমোহন বাগচীর তুলনায়।

৩.

যতীন্দ্রমোহন বাগচী আধুনিক কবি। আধুনিকতার প্রকাশ সংশয়ে, যন্ত্রণায়, বিশ্বাসে, প্রত্যয়ে। ভগবদ্‌ভক্তিমূলক কবিতা তিনি কমই লিখেছেন, প্রায় চোখে না পড়ার মত কম। দুঃখের অভিঘাত এসেছে, অভিজ্ঞতার জগৎ বেদনামথিত হয়েছে, কিন্তু তারই মধ্যে জীবনের প্রতি গভীর ভালোবাসা, মানবিক মূল্যবোধের প্রতি একান্ত নির্ভরতা তাঁকে আশাবাদের মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়েছে। যতীন্দ্রমোহন 'দুঃখবাদী বন্ধুর প্রতি' বলেছেন :

বন্ধু, বারেক চোখ চেয়ে দেখ—উঠে পূর্ণিমা-চাঁদ,
আকাশের তীরে মুছে যায় ধীরে আঁধারের অপরাধ।
তিথিতে তিথিতে জমে' যে বেদনা মরিল সূতিকাঘরে,
তারি বুক চিরে—হের কি মাণিক জ্বলিল তোমারি তরে।

অন্ধকার সত্য, কিন্তু আলোও সত্য। এইখানেই যতীন্দ্রমোহন দুঃখবাদী নন। শোপেনহাওয়ার বলতেন, দুঃখের ক্ষণিক বিস্মৃতিকে আনন্দ বলে, আসলে দুঃখই সত্য, আনন্দ বিস্মৃতি মাত্র। 'অন্ধকার' অবলম্বনে বাঙালী দুই কবির কবিতা দুটি একসঙ্গে পড়লে এই মানস-পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে। যতীন্দ্রমোহনের 'মিতা' যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত লিখেছেন : "যতীনের এক অদ্ভুত খেয়াল হল যে, কবিতার কতকটা লিখবে সে, বাকিটা লিখব আমি। আমার কবিতায় চির হতাশার আর্তরব, তার কবিতায় আনন্দের আস্বাদের সুর। যে, কারণেই হোক, আমি এরকম দ্বৈত কবিতার পক্ষপাতী ছিলাম না। তবু তারই অনুরোধে দু'চারটে কবিতা লিখেছিলাম,—যেমন তার 'অন্ধকার' কবিতা লেখার পর আমার 'অন্ধকার' লিখতে হয়েছিল। কিন্তু তার জোড় মেলেনি।"[১৩] জোড় মিলতে পারে না। 'যতীন্দ্র-

মোহন অন্ধকার-বন্দনা করেছেন, কারণ অন্ধকারের উৎস থেকে উৎসারিত আলো তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন, এবং সেইজন্যই অন্ধকারের ভয়ঙ্কর নাস্তি-রূপ অনুভব করেও, তিনি প্রার্থনা জানান :

হে শঙ্করি, হে প্রলয়ঙ্করি,
তবু বর দাও দেবি, এ জীবনে তোমারেই বরি।
জীবনের পূর্বপারে তুমি ছাড়া কে ছিলে মা আর ?
মাঝে দুদিনের সেতু, আছ তুমি ঘেরি পরপার,
হে চির-আঁধার।
তোমার অনন্ত রূপ চিনিবারে এ মর জীবনে
দীপ্তি এ নয়নে। (অন্ধকার)

এখানে লক্ষ্য করতে হবে, দুঃখ বা অন্ধকারকে অস্বীকার করছেন না যতীন্দ্রমোহন। রবীন্দ্রনাথের মত তিনি বলছেন না, দুঃখ এবং আনন্দ সমার্থক, এবং সেই জন্যই দুঃখ বরণীয়। যতীন্দ্রমোহন বরং বলেন, দুঃখের অবশেষে আনন্দ। (বলাবাহুল্য রবীন্দ্র-সাহিত্যে এমন কথাও শুনেছি, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ এক্ষেত্রে মোটের উপর অদ্বৈতবাদী)। যতীন্দ্রমোহনের জীবন দর্শনকে তাই লোকায়ত বলতে পারি। যতীন্দ্র-মোহন জানেন ;

আসল কথা কি, যতখানি সুখ—ঠিক ততখানি দুখ,
দিবারাত্রির আলোয় কালোয় যেমন কালের মুখ।
সুখী বলে তাই সুযোগ পেয়েছ দুঃখেরে জানিবার,
নহিলে দুঃখে চিনিতে চক্ষে থাকিত না অধিকার। (দুঃখবাদী বন্ধুর প্রতি)

তাহলে সুখও আছে, দুঃখও আছে। মৃত্যু যদি সত্য হয়, প্রেমও তবে সত্য। রবীন্দ্রনাথের 'আনন্দবাদ' বা 'শান্ত শিবের বাণী' তাই যতীন্দ্র-কাব্যে প্রতিধ্বনিত না হলে হতাশ হওয়ার কিছু নেই। আসলে এখানেই যতীন্দ্রমোহনের স্বাতন্ত্র্য। যৌবনের প্রেম-স্বপ্ন যদি বয়সের ভারে অবসিত হয়, তবে নিরাশ্বাস হবো না। 'পঞ্চশর মূর্ছাগত পঞ্চাশের পারে,/প্রীতির কথা জাগায় শুধু স্মৃতির বেদনারে ;' কিন্তু

অনেক হারিয়েও কিছু পাওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায়, আর তাই উত্তর-যৌবনেও 'শ্রাবণ রাতে কেয়ার বাসে মরণ যদি ঘনায়ে আসে,/ তোমার পাশে একটি ফুল ভিক্ষা তাই মাগি।/এ ঘোর রাতে বাদল রা'তে রয়েছি আমি জাগি॥' তাহলে থাকে কি? থাকে প্রেম, থাকে সৌন্দর্যের অভীপ্সা, থাকে জীবনানুরাগ। তাই 'পঞ্চাশোর্ধে' পৌঁছে কবির মনে হয়:

যতই বলুন কবিরা সব - 'কোকিল ডাকার মানে,
পঞ্চাশতের নীচে যারা, তারাই ভালো জানে'—
চঞ্চলতার মাঝ-দরিয়ায় স্রোতের মুখে ভেসে'
কবে কে আর দেখল চেয়ে তটের সীমা দেশে। (পঞ্চাশোর্ধে)

কিন্তু কবি আজও 'অন্ধ বকুল গন্ধ পথে দেয় যে লিপিখানি,' প্রিয়ার খোঁপায় কে বুঝিবে হায়, তার বেদনা বাণী?' -এই অনুভব অস্বীকার করতে পারেন না, এবং হয়তো এইখানেই তাঁর জয়।

প্রেম, প্রীতি, ভালোবাসায় বিশ্বাস যতীন্দ্রমোহনকে জীবন সম্বন্ধে অস্তিসূচক প্রত্যয় দিয়েছে। তিনি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের মতো কখনো বলবেন না, 'প্রেম বলে কিছু নাই', বরং বলবেন:

সত্যই যে আনন্দই চাই, গান চাই, চাই আলো -
মরণের কোলে বসে দণ্ড দুই তবু বাসি ভালো।
বিরহের চিন্তা-চিতা জাগে,
তবু হায়, অন্ধ অনুরাগে
বক্ষ মাঝে চেপে ধরি প্রাণপণে—যারে ভালো লাগে। (উৎসবে)

প্রবলভাবে চাইতে পারলে তবেই বুঝি কিছু পাওয়া যায়। এবং চাওয়ার মধ্য দিয়েই কবি-ব্যক্তিত্বের প্রকাশ স্পষ্ট হয়।

একেই আমরা আধুনিকতা বলছি। বিষ্ণু দে এই আধুনিক যুগেরই পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন: 'রৌদ্রের এ অভিযান আরম্ভ যে রাত্রিশেষে, সে রাত্রি আশাভঙ্গের, জিজ্ঞাসার, আত্মসচেতনার, যে আন্দোলনের রাত্রিতে আসে সংগঠনের প্রভাত। এলিঅটের

প্রভাব সেখানে রূপকবৎ, সে রূপক খুললো গান্ধীজির নীতির গোধূলিতে, রবীন্দ্রনাথের সমর্থ নিভৃতিতে লালিত খোলাহাওয়ার ধ্যান ধারণায়।'[১৪] অবশ্যই যতীন্দ্রমোহনের পক্ষে খুব সহজ হয় নি, রাত্রিবন্দনার মধ্য দিয়ে রৌদ্রাভিযানের জয়ধ্বনি করা। আধুনিক কবির কাব্যে যে মানস-অভিজ্ঞতার রূপায়ণ, যতীন্দ্রমোহনের কাব্যে তা যেন অলক্ষ্য, কিছু অস্পষ্ট।

আধুনিক কবিই বা বলি কেন, রোমান্টিক কবির কাব্যেও এই যন্ত্রণা-উত্তরণের চেষ্টা দেখেছি। অবশ্য সকলেই উত্তীর্ণ হতে পেরেছেন এমন নয়, যেমন কোলরিজ। সেখানেও তাঁর কাছে,—

There was a time when earth, and sea, and skies,
The bright green vale, and forest's dark recess,
With all things, lay before mine eyes
In steady loveliness :

কিন্তু এখন ? কোনো আলো দেখতে পাচ্ছেন না, কোন সুর শুনতে পাচ্ছেন না, শুধু—

'A grief without a pang, void, dark and drear,
A stifled, drowsy, unpassioned grief,
Which finds no natural outlet no relief,
In word, or sigh or tear.'

অবশ্য এরই পাশে ওঅর্ডস্বার্থ আছেন। 'দুঃখবাদী বন্ধু' কোলরিজের প্রতি যেন তিনি উত্তর দিতে গিয়ে বলেছেন,[১৫] প্রকৃতিকে উদ্দেশ্য করে ;

My heart is at your festival,
My head hath its coronal,
The fulness of your bliss, I feel—I feel it all.

ওঅর্ডস্বার্থও যন্ত্রণা অনুভব করেছেন, কবিতার প্রথমাংশে সেই যন্ত্রণার ইতিবৃত্ত আছে, কিন্তু জীবন এবং প্রকৃতিকে ভালোবেসেই তিনি সেই হতাশাকে উত্তীর্ণ হয়েছেন। এখানে যতীন্দ্রমোহনের সঙ্গে ওঅর্ডস্বার্থের তুলনা অপ্রাসঙ্গিক, কিন্তু রোমান্টিক কবিদের সঙ্গে তাঁর তুলনাও অপ্রতিরোধ্য। যতীন্দ্রমোহন রোমান্টিক কবির বিশ্বাস এবং প্রত্যয়েরই উত্তরাধিকারী। কিন্তু যতীন্দ্রমোহনের কবিতায়

যেন জীবনের পূর্ণ প্রতিচ্ছবি পেলুম না, যন্ত্রণাকে তিনি স্বীকার করেও প্রচ্ছন্ন রাখলেন, হতাশার অস্তিত্বকে মেনেও তাকে কাব্য-স্বীকৃতি দিলেন না; তিনি শুধু জীবনেরই বন্দনা করলেন, যে জীবন প্রেম এবং প্রীতিতে, সৌন্দর্য এবং সুষমায় পূর্ণতার আভাস দেয়। 'অসম্পূর্ণ real' ও 'সম্পূর্ণ ideal' এর দ্বন্দ্বরূপটি স্পষ্ট হলো না। যতীন্দ্রমোহনের কবিতা তাই সৎ কাব্য প্রয়াস হিসাবে প্রশংসনীয় হলেও, মোহিতলাল মজুমদার কিংবা যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের কবিতার মত হৃদয়ের গভীরতম আনন্দ-বেদনাকে স্পর্শ করতে পারে না। এইখানেই যতীন্দ্রমোহনের সীমা।

১। A Vision of the Last Judgement in Poetry & Prose of William Blake (London 1939) পৃ: ৬৫২।

২। Stephen Spender: Collected Poems (London 1955) পৃ: ৩২।

৩। ঐ ঐ পৃ: ৩৭।

৪। Erich Heller: The Disinherited Mind (London 1961) পৃ: ২৩৩।

৫। বুদ্ধদেব বসু: 'ভূমিকা'। আধুনিক বাংলা কবিতা (১৯৬৩) পৃ: আট।

৬। 'সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতা' (১৯৩৮ ॥ ১৯৫৭), (১৯৫৭) পৃ: ৯৭।

৭। Erich Heller: The Disinherited Mind. পৃ: ২৩৪।

৮। বঙ্কিমচন্দ্র: ধর্মতত্ত্ব—অনুশীলন। (বঙ্কিম রচনাবলী-২য়। সাহিত্য সংসদ সং ১৩৬৬) পৃ: ৬২২।

৯। বঙ্কিমচন্দ্র: 'একা' এবং 'আমার মন'। কমলাকান্তের দপ্তর। (বঙ্কিম-রচনাবলী) পৃ: ৫১/৬০।

১০। রবীন্দ্রনাথ: 'সভ্যতার সংকট'। কালান্তর (১৩৫৫) পৃ: ৩৯০।

১১। কালিদাস রায়: আহরণ (১৩৫৭) পৃ: ২৫২।

১২। করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়: শতনরী (১৩৫৫) পৃ: ২২৬।

১৩। যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত: 'মিতার স্মরণে'। পূর্বাচল (ফাল্গুন ১৩৫৪)।

১৪। বিষ্ণু দে: এলোমেলো জীবন ও শিল্প-সাহিত্য (১৯৫৮) পৃ ৮২।

১৫। কোলরিজ এবং ওঅর্ডস্বার্থের এই তুলনার জন্য দ্রষ্টব্য C. M. Bowra: The Romantic Imagination (London 1961) পৃ: ৮৪-৮৭। —কোলরিজের উদ্ধৃতিটি 'Dejection' কবিতা থেকে, ওঅর্ডস্বার্থের উদ্ধৃতিটি 'Ode on Intimation of Immortality' কবিতা থেকে।

❋

প্রসাধন কলা

রবীন্দ্রনাথ আধুনিক বাংলা কবিতার যে বিশিষ্ট রসরূপ দান করলেন, তারই নাম গীতিকবিতা। শিল্প এবং সঙ্গীত আমরা পেয়েছি উত্তরাধিকার সূত্রে, গীতিকবিতা আধুনিক যুগের সৃষ্টি। সঙ্গীত থেকেই গীতিকবিতার জন্ম তাতে সন্দেহ নেই, এবং সঙ্গীতকেই আরিস্টট্‌ল যখন অনুকরণাত্মক শিল্পের আদর্শ বিবেচনা করেছিলেন. তখন তাঁর মনে ছিল সঙ্গীতের প্রত্যক্ষ হৃদয়ভাব প্রকাশ-ক্ষমতা, যা শব্দের সহস্র কবিত্বময় প্রয়াসেও অসম্ভব, এবং এ'থেকেই গীতি-কবিতাও ব্যক্তি-ভাবোচ্ছ্বাসের অন্যতম বাহন হয়ে উঠলো। কিন্তু গীত ও কবিতার বিচ্ছেদ আধুনিক কালের ঘটনা, শব্দের মর্যাদা এ-যুগেই বিশেষভাবে স্বীকৃত হলো।

হৃদয়ের সংবাদকে কবিতার বিষয় করতে হলে গীতিকবিতার আধার উপযোগী সন্দেহ নেই। কিন্তু সেই একই সংবাদ প্রকাশিত হতে দেখি মহাকাব্যে কিংবা নাটকে। এবং আধুনিক যুগেও মহাকাব্য ও নাটকের প্রয়োজন অল্প মাত্র কমেনি। আবেগের উৎস জীবন, যে জীবনে ঘটনার আবর্ত, সংঘাতের দ্বিমুখিতা সবই স্বীকার্য। কাহিনীর প্রাধান্য আবেগোৎসারণের একান্ত প্রয়োজন অপেক্ষা যখন বেশী, তখনই কবিতা মহাকাব্য বা আখ্যানকাব্যের ধর্ম নিতে চলেছে। ঘটনার প্রাধান্য সংঘাতের প্রয়োজনে আবেগ-ধর্মকে বিস্তার দান করলে তখনই কবিতা নাটকের ধর্ম লাভ করছে। গীতিকবিতায় আবেগ সরল এবং স্পষ্ট, একমুখী এবং প্রত্যক্ষ।

আধুনিক যুগে বিচিত্র পথে মনের যাত্রা,—আলো-আঁধারি তুচ্ছতার জগতে, বর্ণাঢ্য গৌরবোজ্জ্বল সংরাগ মুহূর্তে, নিঃসঙ্গ নিরাবরণ আত্মার উদ্‌ঘাটনে কবিতার ক্ষেত্র ক্রমেই প্রসারিত হচ্ছে। এবং হয়তো শেষ পর্যন্ত মহাকাব্য, নাটক, গীতিকবিতা মিলে মিশে এক

নূতন শিল্পরূপ গড়ে উঠছে, যা একান্তভাবেই আধুনিক যুগের সৃষ্টি। প্রাচীন সাহিত্যে মহাকাব্যের বিস্তার ছিল, নাটকের উত্তেজনা ছিল, সংগীতের অন্তর্মুখিতা ছিল। কিন্তু এই তিনের সম্মিলনে আধুনিক মনের প্রকাশ ছিল না।

অবশ্য প্রকাশই কবিত্ব,—এ বোধ নিত্যকালের। অভিজ্ঞতার প্রাত্যহিকতাতেই হোক, আর অনুভবের চিরন্তনতাতেই হোক, আমার সংবাদ পৌঁছে দেব অন্যের মনে, এই ইচ্ছা থেকেই শিল্পের জন্ম। সঙ্গে সঙ্গে দায়ীত্ব আছে প্রকাশ সুষমার, কেমন করে ব্যক্তি-হৃদয়ের কথা অন্যের হৃদয়ে সঞ্চারিত হবে, তার জন্য চাই ভাষা, ছন্দ, অলঙ্কার, চাই কাব্যের শিল্পরূপ। আধুনিক কবির সমস্যা আরো বেশী, বলবার কথা বেড়েছে, কারণ অভিজ্ঞতা আর অনুভবের ক্ষেত্রও অনেক বেড়েছে আগের তুলনায়। যুগটাও সন্দেহপরায়ণ, কোনো কিছুই বিশ্বাস করতে চায় না। কবিতাকে বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে হবে, তবেই সে হৃদয়কে স্পর্শ করবে। স্ফটিকের বুকে নানা রঙের ছায়া, যাকে ধরা যায় না তাকে ধরতে হবে, যাকে ছোয়া যায় না তাকে ছুঁতে হবে।

রোমান্টিক কবিরা অনেক ভেবেছিলেন ভাব ও রূপের এই সমন্বয়কর্ম নিয়ে, কখনো কাহিনী রচনার বাস্তবতায়, কখনো অতীত চারণের মোহময়তায়, আবার কখনো প্রত্যক্ষ হৃদয়োদ্ঘাটনের করুণ প্রয়াসে তাদের কবিতা পথ দেখিয়েছে, এবং হয়তো ব্রাউনিঙে এসে সাময়িক লক্ষ্যপ্রাপ্তি ঘটলো। 'ওয়াডস্বার্থ ও কোলরিজ ছাড়া একমাত্র ব্রাউনিঙ্-ই বুঝেছিলেন যে যদি বাঁচতে চায়, তবে ধ্বংসাবশিষ্ট পৈতৃক প্রাসাদের অন্তঃপুরে বসে রূপকথার রাজপুত্রের স্বপ্ন দেখা কাব্যের আর চলবে না, তাকে বেরিয়ে আসতে হবে, পোকায় খাওয়া শিরোপা মরচে-পড়া সাঁজোয়া, রজ্জুসার জয়মাল্য ফেলে তাকে বেরিয়ে আসতে হবে হাটের মাঝে, যেখানে পাপ-পুণ্য, ভালো-মন্দ, দেব-দানব সমস্বরে জটলা পাকাতে ব্যস্ত। তাঁর সম-

সাময়িকদের মধ্যে শুধু ব্রাউনিঙ্-ই অস্পষ্টভাবে মেনেছিলেন যে নাটকের নৃত্যের তাল সব সময় শ্রবণ-সুভগ নয়, সৃষ্টির সুরে আসন্ন প্রসবার আর্তনাদও মাঝে মাঝে শোনা যায় ; একা তিনিই জেনেছিলেন যে সিদ্ধ-সমৃদ্ধদের অসহযোগে জীবনের মিছিলে হয়তো আড়ম্বরের অভাব ঘটে, কিন্তু নিঃস্ব-লাঞ্ছিতদের অপাঙ্ক্তেয় ভাবলে, সে শোভাযাত্রার সঙ্গে শবযাত্রার কোনও প্রভেদ থাকে না। সেই জন্য ব্রাউনিঙ্-ই সবপ্রথমে কাব্যকে যুগরূপের ছাঁচে ঢালতে গিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি কেবল চেষ্টাই করেছিলেন, সফল হননি।'[১]

রবীন্দ্রনাথও সমগ্র জীবন চেষ্টা করেছিলেন অনুভবের সামগ্রীকে প্রকাশক্ষম করার। কখনো প্রাচীন কাব্যরীতির অনুবর্তনে, যেমন সনেট বা আখ্যান-কাব্য, সংগীত মুখ্য গীতিকবিতা বা বর্ণনাত্মক খণ্ডকাব্য রচনা করেছেন। কিন্তু 'মানসী' থেকেই রবীন্দ্রনাথের নূতনতর চেষ্টা লক্ষ্য করি, এবং বাংলা কাব্য ক্ষেত্রে গীতিকবিতার সঙ্গে আখ্যানকাব্য ও নাটকের সমন্বয় প্রয়াস ঘটলো। 'পুরুষের উক্তি', 'নারীর উক্তি', 'সুরদাসের প্রার্থনা' থেকে সুরু করে 'মেঘদূত', 'অহল্যার প্রতি' পর্যন্ত নানা পথে সেই একই লক্ষ্যে উপনীতির চেষ্টা। অবশ্য 'প্রেমের অভিষেকে' ও সাফল্য আসেনি ; 'বিদায়-অভিশাপ' থেকে 'লক্ষ্মীর পরীক্ষা' পর্যন্ত একই পরীক্ষা-নিরীক্ষা। রবীন্দ্র-কাব্যের শেষপর্বে এই সমন্বয় প্রায়-সার্থক, অন্ততঃ রবীন্দ্র-ভাবনা প্রকাশক্ষম।

যতীন্দ্রমোহন রবীন্দ্রনাথকে আদর্শ বিবেচনা করেছিলেন। কিন্তু লক্ষ্য করতে হবে 'ওড্' কিংবা 'সনেট' রচনায় প্রথম থেকেই তাঁর আগ্রহ সামান্য। 'অবিমিশ্র গীতিকবিতা' লেখার চেষ্টাও যেন নেই। অবশ্য 'সরোবরে সন্ধ্যা' আদর্শ গীতিকবিতা। দৃশ্যচিত্র যেখানে ভাবময় হয়ে উঠেছে, কবিদৃষ্টি যেখানে অখণ্ড সৌন্দর্য-প্রাণতায় সন্ধ্যার বিষণ্ণতাকে অনুভব করেছে, সরোবরের একাকীত্ব যেন বিষয়ের একত্বকেই সূচিত করেছে। কিন্তু যতীন্দ্রমোহনের আগ্রহ

চিত্রের দিকে, এবং আরও বেশী চরিত্রের দিকে। যদিও যতীন্দ্রমোহন কখনো নাটক লেখেননি, তবু স্ফটিকের মত বিচিত্র রঙ্‌কে ধরবার আগ্রহ তাঁর মধ্যে সর্বদা দেখেছি। তাই 'কেয়াফুল'-এর মতো আত্মমগ্ন কবিতাতেও দৃষ্টি একমুখী নয়, পসারিণীর অন্তর্বেদনা প্রকাশেও সমান ব্যাকুলতা। গীতিকবিতা হিসাবে প্রশংসনীয় নয়, কিন্তু এখানেই কবির নূতনতর শিল্পরূপ সৃষ্টির চেষ্টা চোখে পড়ে। কিংবা 'প্রান্তর পথে' কবিতায় কাহিনী-রস এবং গীতি-রসের সমান্তরাল অবস্থানে কবির বৈফল্য ক্ষমতার সীমা স্মরণ করিয়ে দেয়।

যতীন্দ্রমোহন চেয়েছিলেন বহুজনের আশা-আনন্দ, বেদনা-হতাশাকে কাব্যরূপ দেবেন। সহজ ছিল না প্রচলিত কাব্যাদর্শে তার রূপদান। কিন্তু এই ইচ্ছা থেকেই তাঁর কাব্যের বিশিষ্ট শিল্পরূপ, অবশ্য ওঅর্ডস্বার্থের মত তিনি গদ্য-পদ্যের ব্যবধান দূর করতে চাননি। আসলে তিনি বাক্‌ভঙ্গীকে আশ্রয় করে জীবনের নাটকীয় মুহূর্তগুলিকে কাব্যে পরিবেষণের চেষ্টা করেছেন। এরই ফলে সৃষ্টি হয়েছে নাটকীয় স্বগতোক্তি (ড্রামাটিক মোনোলগ), নাট্যকাব্য (ড্রামাটিক লিরিক) এবং নাট্য-কথা (ড্রামাটিক ফেব্‌ল)।

"কবিতার ভাষা ছিল প্রথম যুগে নাটক সৃষ্টির স্বাভাবিক অবলম্বন। ফলে কাব্য-নাট্যকে বলা যায় নাটকের প্রাথমিক রূপ। কিন্তু গ্রীক্‌রা অথবা শেকস্‌পীঅর ভালোই জানতেন যে নাট্যকলা জীবনের প্রত্যক্ষ ছবি। কবিতার ভাব কেমন করে জীবনের এই প্রত্যক্ষতা প্রমাণ করে? ড্রাইডেন এ সমস্যার উত্থাপন করেছিলেন। আমরা কি ছন্দে কথা বলি? না ছন্দে বলি না, তবে আমাদের দৈনন্দিন জীবন এবং আলাপন থেকে যে ছন্দ আবিষ্কৃত হয় এবং যা আমাদের আদিম সত্তার স্পন্দনের সঙ্গে স্মৃতির দ্বারা যুক্ত করে দেয়, তাকে যোগ্য রূপ দেওয়াই সাহিত্যের ধর্ম।....কিন্তু পরবর্তী কবিকুল পূর্বসূরীর সাধনাকে পেয়ে যান প্রথার মধ্যে। প্রথার সাধনায় ক্রমে জীবনের নিঃশ্বাস অস্পষ্ট হয়ে আসে। তখন 'নাট্য' কথাটি এক

ম্রিয়মান আঙ্গিক হয়ে পড়ে মাত্র, কাব্যই অধিকার করে নেয় প্রধান ভূমি। কবি তাঁর ব্যক্তিগত আবেগ ও ধারণাবলী বিন্যস্ত করে প্রকাশ করতে চান, জীবন থেকে অনুভব নয়, অনুভব থেকে জীবনের দিকে অগ্রসর হতে চান। এ পদ্ধতির জন্য স্বতন্ত্র রীতির প্রয়োজন। তার পরিবর্তে যদি পুরাতন কাঠামোকে গ্রহণ করেন তবে কাব্য-নাট্যের পরিবর্তে দেখা দেয় নাট্যকাব্য, কখনো বিশদ, কখনো সংহত।"[২]

নাট্যকাব্যের আধার নাটকের, কিন্তু তার প্রাণ গীতিকবিতার। যতীন্দ্রমোহন নাট্যকাব্য লিখেছেন; সেই 'ক্ষমা' থেকে 'শবরীর প্রতীক্ষা' পর্যন্ত একই চেষ্টা কিন্তু নাট্যকাব্যের আঙ্গিকটি তিনি আয়ত্ত করতে পারলেন না। 'ক্ষমা' অবশ্য অতি সংক্ষিপ্ত, কিন্তু 'শবরীর প্রতীক্ষা'য় সম্ভাবনা ছিল। 'নাট্যকাব্য' না বলে একে 'ক্লোসেট ড্রামা'ও বলতে পারি, কারণ উক্তি-প্রত্যুক্তির সঙ্গে সঙ্গে বিবৃতিও কবিতাটিতে অনেকখানি অংশ নিয়েছে। কিন্তু বাক্‌ভঙ্গীর অনুসরণে সংলাপ সজীবতা পায় নি, তবে কবির চেষ্টা আমরা সহজেই অনুভব করতে পারি।

কি ভাবিব? কিবা আছে আর?
প্রভু, পিতা,—এ জগতে কি আমার আছে বা চিন্তার?
সবই সুবিজ্ঞাত তব—চিন্তা, চেষ্টা, স্মরণ, মনন,—
যেদিন ও পাদপদ্মে পতিতারে দিয়াছ শরণ
আপনার কন্যা বলি,—ইষ্টমন্ত্র সঁপি তার কানে
আজন্ম-দুর্ভাগা এই গৃহহীন অনার্য-সন্তানে
পালিয়াছ শিষ্যারূপে পবিত্র এ তপোবন বাসে।

ব্রাউনিঙ্‌ অবশ্য 'ড্রামাটিক মোনোলগ'কেই 'ড্রামাটিক লিরিক' (নাট্যকাব্য) নামে অভিহিত করেছেন, এবং যতীন্দ্রমোহন 'ড্রামাটিক মোনোলগ' রচনায় যে অসামান্য কৃতিত্ব দেখিয়েছেন তা সর্বথা স্বীকার্য। নাটকীয় একোক্তিতে দেখি যতীন্দ্রমোহনের সংলাপ আশ্চর্য সাবলীলতা লাভ করেছে। অবশ্য একে 'সংলাপ' বলা যায় কিনা

সন্দেহ, তবে অদৃশ্য এক শ্রোতার উপস্থিতি এমন কৌশলে বিশ্বাসযোগ্য করে বলা হয় যে, একোক্তির দীর্ঘতাও কৃত্রিম মনে হয় না। একোক্তিতে গীতিকবিতার উপাদান সর্বাধিক, কিন্তু চরিত্র সৃষ্টির ক্ষমতা থাকা চাই। ড্রামাটিক মোনোলগ একটি সম্পূর্ণ সাহিত্যকর্ম বলেই, তার মধ্যে চরিত্রসৃষ্টি এবং বিন্দুতে সিন্ধুদর্শনের মত বিশেষ একটি ঘটনার মধ্যে নাটকীয় তাৎপর্য আবিষ্কার করতে হবে। নাট্যকাব্যের মতই, অথবা ড্রামাটিক মোনোলগ আসলে নাট্যকাব্য বলেই, তার মধ্যে একই সঙ্গে নাট্যধর্ম ও গীতিধর্ম রক্ষার চেষ্টা; সঙ্গীত ও চিত্র, আবেগ ও চরিত্র মিলে মিশে নাটকীয় একোক্তি। যতীন্দ্রমোহনের অধিকাংশ কবিতাই এই বিশিষ্ট শিল্পরূপ অবলম্বন করেছে, সামান্য উদ্ধৃতির সাহায্যেই তাঁর সাফল্য প্রতিষ্ঠিত হবে।

ক। —এইখানেতে একটু ধরিস ভাই,
পিছল ভারি—ফসকে যদি যাই—
এ অক্ষমার রক্ষা কি আর আছে।
আসুন ফিরে—অনেক দিনের আশা,
থাকুক ঘরে, না থাক্ ভালবাসা—
তবু দুদিন অভাগিনীর কাছে।
জন্মশোধের বিদায় নিয়ে ফিরে—
সেদিন তখন আসব দীঘির তীরে। (অন্ধবধূ)

খ। —উহু—সেই ব্যথা, আবার আবার।
—কে ও? কাছে এস, হে সঞ্জয়,
দুর্জয় তব দুর্যোধনের
হের এই দশা বিপর্যয়!
কুরুকুল,—সে কি নির্মূল তবে,
কুরুক্ষেত্র ধ্বংস নাকি?
বলো না মন্ত্রি, নিশ্চুপ কেন?
বুঝিবার আর আছে কি বাকি!
—ভাবিতেছ মনে, দুর্যোধনেরে
শুনাবে না সেই অশুভ কথা।—
হায়, তাত! এই মৃত্যুর কূলে
আছে তার কোনো সার্থকতা?
(দুর্যোধন)

২.

যোগ্যতম শব্দের যোগ্যতম অবস্থানেই কবিতার সৃষ্টি, --কোলরিজের এই কাব্যসংজ্ঞা বহু আলোচিত হয়েছে। শব্দ-চেতনা আধুনিক কাব্যের অন্যতম পরিচয়। অবশ্য প্রাচীন কাব্যেও এই সত্য স্বীকৃত, এবং কবি-ভাষা বা পোয়েটিক ডিক্‌সন কাব্যসৃষ্টির নিত্য অবলম্বন, একথা গ্রীক্ বা সংস্কৃত অলংকার শাস্ত্রেও সর্বমান্য। কিন্তু ওঅর্ডস্বার্থ যখন বললেন গদ্য এবং পদ্যের ভাষাগত অনৈক্য তিনি দূর করবেন, তখন কাব্য-বিষয়ের রূপান্তরও তাঁর পরিকল্পনায় স্বীকৃতি পেল। অবশ্যই 'গদ্য-পদ্যের সমীকরণ-চেষ্টায় ওয়ার্ডস্বার্থ কৃতকার্য হননি; কারণ দৈনন্দিন ভাষা আর কাব্যের ভাষা বস্তুতই বিভিন্ন, বৈধ মতেই বিভিন্ন; এই প্রভেদ গদ্যের ও পদ্যের স্বভাবগত। গদ্যের অবলম্বন বিজ্ঞান, কাব্যের অন্বিষ্ট প্রজ্ঞান। তাই গদ্য চলে যুক্তির সঙ্গে পা মিলিয়ে, আর কাব্য নাচে ভাবের তালে তালে; গদ্য চায় আমাদের স্বীকৃতি, আর কাব্য খোঁজে আমাদের নিষ্ঠা; রেখার পরে রেখা টেনে পরিশ্রান্ত গদ্য যে ছবি আঁকে, গোটাকয়েক বিন্দুর বিন্যাসে কাব্যের যাদু সেই ছবিকেই ফুটিয়ে তোলে আমাদের অনুকম্পার পটে। কাব্যের এই মরমী ব্রতে সিদ্ধি আসে প্রতীকের সাহায্যে। শব্দ মাত্রেরই দুটো দিক আছে; একটা তার অর্থের দিক, অন্যটা তার রস প্রতিপত্তির দিক। গদ্যের সঙ্গে শব্দের সম্পর্ক ওই প্রথম দিকটার খাতিরে; গদ্যে শব্দগুলো চিন্তার আধার। কিন্তু কাব্য শব্দের শরণ নেয় ওই দ্বিতীয় গুণের লোভে; কাব্যের শব্দ আবেগবাহী।'[৪] সুতরাং গদ্য-পদ্য অভিন্ন না হয়েও, পদ্যের ক্ষেত্র সুবিস্তীর্ণ। অবশ্যই পদ্যের ভাষা প্রতীকধর্মী, অর্থাৎ ব্যঞ্জনাময়, কিন্তু হৃদয়ভাব প্রকাশ করার জন্য 'কবিয়ানা' করার প্রয়োজন সর্বত্র নেই। বিশেষতঃ যে কবি ড্রামাটিক মোনোলগের কাব্যরূপ গ্রহণ করেছেন, তিনি ভাষাকে যতদূর সাধ্য মুখের ভাষার কাছাকাছি আনার চেষ্টা করবেন।

রবীন্দ্রনাথ লঘু জাতের কবিতায় কিংবা শিশু-কাব্যে এই রীতির অনুসরণ করেছেন। কিন্তু সেখানে বিষয়-সীমা সুস্পষ্ট। যতীন্দ্রমোহনের কৃতিত্ব, হৃদয়ের যন্ত্রণা প্রকাশেও ভাষাকে এই কথ্যরূপের প্রতীকতা দিতে পেবেছেন, একই সঙ্গে বাক্‌ছন্দ এবং ব্যঞ্জনাকে প্রচলিত শব্দেব আশ্রয়ে কাব্যের সামগ্রী করে তোলা অসাধারণ ব্যাপাব। এই যুগের আব কোনো কবি এমনটা পেরেছেন বলে মনে হয় না। অবশ্য লোক-সাহিত্যে এব নিদর্শন আছে। কিন্তু যতীন্দ্রমোহনেব কবিতায় আঞ্চলিক গ্রাম্য ভাষার পরিবর্তে রবীন্দ্র-যুগের মার্জিত পবিশীলিত ভাষাব শিষ্টরূপ প্রযুক্ত হলো। কাহিনীর আভাস এই 'কবি-ভাষা'কে সাহায্য কবেছে, কিন্তু যতীন্দ্রমোহনের কবি-প্রবণতাও এব মধ্যে লুকিয়ে আছে। কবিতা এই বিশিষ্ট ভাষা অবলম্বনে শুধু তাই বোধেব সামগ্রী থাকেনি, মনের গভীরে তার সহজস্পর্শ, একটি চরণ ভুলতে না পেবে মনের মধ্যে বারবার ফিরে আসা।

ক। —সত্যি কথা বলব কি মা, দোখ ঘুমের ঝেঁাকে—
সন্ধ্যা যেন এল বাতাস ছেয়ে,
হুহু করে ঠাণ্ডা বাতাস লাগছে মুখে চোখে,
সাগর-তীরের ওপার থেকে বেয়ে। (গঙ্গাসাগর)

খ। ঝাঁ ঝাঁ দুপুর—সেদিন দেখি, কূপের ধারে চাইতে এল জল,
রুখু মাথা শুক্‌নো মুখে চোখ দুটো তার তবু কি উজ্জ্বল!
একলা আমি ঘরে,—
কি কববো আর, জল দিতে তায়, তেমনি করে চাইল মুখের পরে।
(আশঙ্কা)

'কাজ্‌লা দিদি' এবং 'অন্ধবধূ' কবিতা প্রসঙ্গত আবার মনে পড়বে।

৩.

ভিক্টোরিয় যুগে ইংরেজী কাব্য-সাহিত্যে শব্দচেতনা প্রাধান্য পেয়েছে। শব্দের সুষ্ঠু প্রয়োগ প্রশংসনীয় সন্দেহ নেই। প্রির‍্যাফেলাইট

কবি, যাঁরা চিত্রকরের শক্তি ও প্রবণতা নিয়ে কবিতা লিখেছেন, তাঁদের কবিতা স্বভাবতই চিত্ররূপময় হয়ে উঠেছে। 'ইহাদের বর্ণনা-ভঙ্গী ও শিল্পরীতির একটা বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, ইহারা কবিতার মধ্যে চিত্রকর সুলভ বর্ণে ঔজ্জ্বল্য ও ছবির ন্যায় সুস্পষ্ট রেখা বেষ্টনী (outline) আনিতে চেষ্টা করিয়াছেন। ইহাদের লেখনী যেন বর্ণ-তুলিকার কাজ করিত; ইহারা যেন কবি ও চিত্রকরের শিল্প-প্রণালীর পার্থক্য দূর করিয়া উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য আনিতে প্রয়াসী হইয়াছেন। ইহাদের এক একটি বর্ণনা যেন রঙ্গে ঝলমল, দৃঢ় রেখাবন্ধনীতে সুস্পষ্ট, সাঙ্কেতিকতায় রহস্যময় ছবির মত আমাদের চোখের সামনে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। অবশ্য এই চিত্র-সৌন্দর্যের প্রতি অত্যধিক প্রবণতার জন্য কবিতার অন্যান্য গুণ—ইহার ভাব গভীরতা, গতিবেগ, প্রকাশাতীত আভাসব্যঞ্জনা, ধ্বনিমাধুর্য প্রভৃতি কতকটা চাপা পড়িয়াছে।'[৫] 'ভারতী' যুগের কবিদের সঙ্গে প্রির‍্যাফেলাইট কবিগোষ্ঠীর সাদৃশ্যের কথা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। যতীন্দ্রমোহন হৃদয়-ভাবের কবি হওয়া সত্ত্বেও, তাঁর কবিতায় চিত্র-ধর্ম অত্যন্ত ব্যাপকভাবে দেখা যায়। সূক্ষ্ম রেখাঙ্কণের কারুকার্য এবং উজ্জ্বল ও বিচিত্র বর্ণের ব্যবহারে যতীন্দ্রমোহনের শব্দ-চিত্র বিশিষ্টতা অর্জন করেছে।

ক। বন্ধু আমার, হের ঐ দূরে আকাশের আঙিনায়
স্বর্ণসায়রে খেলিতেছে ঢেউ—নীলে ও নট্‌কনায়,
হের গিরি শিরে তারি নীচে ধীরে রঙে জমে উঠে কায়া,
আসমানি হতে জাফরানি লাল,—বন্ধু, সবতো মায়া। (মায়ামৃগী)

খ। সিন্ধু-শকুন পাখার হাওয়া দিবে মোদের গায়ে,
উড়ো মাছের অভ্র-পালক পড়বে খসি পায়ে;
সূর্যালোকের স্বর্ণ রেণু রচবে আসি ইন্দ্রধনু,
অন্ধনিশি নিঃশ্বসিবে লবণ-বহা বায়ে।

(সমুদ্র ফেনার প্রতি)

এখানে লক্ষ্য করতে হবে, ধূসর বা বিবর্ণ রঙের রঙ্গভূমি নয়, ইন্দ্রধনুর সপ্তরাগচ্ছটায় কবির কল্পনাভূমি উজ্জ্বল ও আলোকিত। কিন্তু সেই সঙ্গে লক্ষণীয়, প্রথম উদ্ধৃতিতে রঙের কোনো স্বতন্ত্র তাৎপর্য না থাকলেও, দ্বিতীয় উদ্ধৃতিতে 'সূর্যালোকের স্বর্ণ রেণু' শুধু বর্ণসমাবেশ মাত্র নয়, এর মধ্য দিয়ে কবির জীবন-দৃষ্টিও প্রকাশিত এবং শেষ পর্যন্ত প্রির্যাফেলাইট কবিদের সঙ্গে যতীন্দ্রমোহনের তুলনা সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে, কারণ পূর্বোক্ত চিত্রকরকবিরা দেখার আনন্দকেই প্রকাশ করেছেন, অনুভবের বেদনাকে তেমনভাবে প্রকাশ করতে পারেন নি। যতীন্দ্রমোহনের কবিতায় রঙ্ ও রেখার সঙ্গে অনুভব মিশেছে, চিত্রের ইন্দ্রিয়নির্ভরতা ভাব প্রকাশের সক্ষমতায় অবসিত।

৪.

শব্দের সাহায্যে চিত্র রচনাকেই ইংরেজীতে 'ইমেজ' বলে, বাংলায় যাকে 'চিত্রকল্প' বলা হয়। চিত্রকল্প কাব্যের অনিবার্য প্রয়োজনে কবির মনে সহজ ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে আবির্ভূত হয়। 'আবির্ভাব' কথাটাই এখানে প্রযোজ্য, যেমন কবির ভাব ও আবেগের আবির্ভাব কবিতায়। চেষ্টাকৃত প্রয়াসে তত্ত্বের উপস্থাপনা সম্ভব, ইন্দ্রিয়নির্ভর বাস্তব চিত্র রচনাও শক্ত নয়। কিন্তু চিত্রকল্প একান্ত-ভাবেই কাব্যের ভাববস্তু তথা কবির অনুভবের সঙ্গে সংলগ্ন। কবি-ভাষা সংক্ষেপে অনেকখানি ভাব প্রকাশে চেষ্টিত, এবং শব্দের প্রয়োগও ইঙ্গিতধর্মী। এই থেকেই অবশ্য অর্থালঙ্কারের সৃষ্টি, উপমা-রূপক অলঙ্কারের সাহায্যেও চিত্রকল্প সৃষ্টি হতে পারে। কিন্তু এখানে মনে রাখতে হবে, উপমান-উপমেয়ের প্রত্যক্ষ সাদৃশ্যই চিত্রকল্পের বড়ো কথা নয়, কবি অ-দৃষ্টপূর্ব সাদৃশ্যকেই আবিষ্কার করেন। কিসের সাহায্যে? অনুভব এবং কল্পনাই চিত্রকল্প রচনা করে। জ্ঞানদাসের পদাবলীতে 'দেখিবারে আঁখি পাখি ধায়',—চিত্রকল্পের দৃষ্টান্ত, কিন্তু নবীনচন্দ্রের কবিতায়—'সেনাপতি!···কাষ্ঠের পুতুল প্রায়/সুসজ্জিত দাঁড়াইয়া আছ একধারে!' উপমা অলঙ্কারের দৃষ্টান্ত হয়েও, চিত্রকল্প

অভিধালাভের অযোগ্য। 'Precision is not everything, perhaps not even the chief thing, in poetic imagery either.'[৬] বস্তুর প্রয়োজন আছে, চিত্রের প্রয়োজনও তাই থেকে ; কিন্তু বস্তুর জন্য বস্তু নয়, চিত্রের জন্য চিত্র নয়, কবিতায় বস্তু বা চিত্র ভাবপ্রকাশের সহায় মাত্র। যেখানে ভাব নেই, কিংবা ভাব দুর্বল, কিংবা অসমর্থ ভাব পাঠক মনে সঞ্চারক্ষম নয়, সেখানে চিত্রের বাস্তব-গুণ, ঔজ্জ্বল্য, অবিকৃতি, কোনো কিছুই কবিতায় চিত্রকল্প রচনা করতে পারে না। এই জন্যই চিত্রকল্পের সঙ্গে শুধু কবির বাস্তব জ্ঞান কিংবা কল্পনা শক্তিই যুক্ত নয়, কবির আবেগ বা অনুভবই চিত্রকল্পকে সাথকতা দেয়। ডেলুইস চিত্রকল্পের সংজ্ঞায়,—'poetic image is a more or less sensuous picture in words, to some degree metaphorical, with an undernote of some human emotion in its context, but also charged with and releasing into the reader a special poetic emotion or passion.'[৭] ইত্যাদি এত কথা বলেও তৃপ্তি পান নি, কারণ আবেগের যথার্থতা প্রমাণিত না হলে চিত্রকল্পের যথার্থতাও স্বীকৃত হয় না।

অবশ্যই কবি-ধর্ম অনুসারে চিত্রকল্পে বৈচিত্র্য আছে ; দৃশ্য, ধ্বনি, স্পর্শ, স্বাদ, প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের নানা আকর্ষণ থেকে নানাধরণের চিত্র রচিত হতে পারে। কিন্তু মনে রাখতে হবে, ইন্দ্রিয়নির্ভরতায় সূচনা মাত্র, পরিণতি ভাবময়তায়। কেমন করে কবির মনের ভাব পাঠকমনে সঞ্চারিত হয়, তার রহস্য কেউ কখনো বলতে পারেন না, তবু কবিতার আসল পরীক্ষা সেখানেই। জীবনানন্দ দাশের কবিতায় যখন পড়ি 'চুল যার শাওনের মেঘ, আর আঁখি যার গোধূলির মত গোলাপি রঙিন,, তারে আমি দেখিয়াছি প্রতিরাত্রে—স্বপ্নে—কতদিন।' তখন কবিকে শুধু 'চিত্ররূপময়' বললেই কি কবির পুরো পরিচয় পাওয়া যাবে ? এখানেই ডেলুইসের ইমেজ প্রসঙ্গে 'sensuousness'

এর প্রতি অতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপ আমাদের কাছে আপত্তিকর মনে হয়েছে।[৮] 'sensuousness'-এ আরম্ভ হতে পারে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত কবিতা আর চিত্র থাকে না, চিত্র আর ভাব মেলে, শেষে ভাবের স্বরাট্ প্রাধান্য। এই জন্যই চিত্রকল্প মাত্রেই সাদৃশ্যমূলক অলঙ্কার হলেও, সাদৃশ্যমূলক অলঙ্কার মাত্রেই চিত্রকল্প নয়।

যতীন্দ্রমোহনের চিত্রাঙ্কণ-দক্ষতার কথা আমরা বারবার বলেছি। সত্যেন্দ্রনাথ দত্তও ভালো ছবি আঁকতে পারতেন। কিন্তু সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতা চিত্র-ক্রম ছাড়া আর কিছুই নয়, 'পাল্‌কীর গান' কিংবা 'দূরের পাল্লা' প্রকৃতপক্ষে কতকগুলি চিত্র-সমষ্টিমাত্র। সত্যেন্দ্রনাথের কবিতায় চিত্রকল্প অতি বিরল। 'শঙ্খচিলের সঙ্গে, যেচে পাল্লা দিয়ে মেঘ চলেছে।' কিংবা 'ঝড়ের বেগে ঝাণ্ডা নিশান ওঠে এবং পড়ে, নীল জাঙিয়া নীল-আঙিয়া অসুর গুলো লড়ে!'—এখানে সুন্দর দৃশ্য চিত্র, কিন্তু কি যেন নেই! আসলে "The visual image is a sensation or a perception, but it also 'stands for', refers to, something invisible, something 'inner'."[৯] এই অন্তর্দৃষ্টি আসে কবির চেতনাগত ভাবৈক্য থেকে। সত্যেন্দ্রনাথের অভাব দৃষ্টির সংহতি, ভাবের ঐক্য, চেতনার গভীরতা। যতীন্দ্রমোহনের কয়েকটি চিত্রকল্প এর পাশে রাখলে কবি-বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট হবে ঃ

ধ্বনি চিত্র— ঝিল্লির মঞ্জীর-মালা ঝিমি ঝিমি-ঝিমি বাজে পায়ে পায়ে।

দৃশ্য চিত্র— ধূসর আকাশ পটে তরঙ্গিয়া দিয়া ভ্রূবঙ্কিম রেখা—
অস্পষ্ট নক্ষত্রালোকে বাদুড়ের শ্রেণী ঊর্ধ্বে দিল দেখা।

(সরোবরে সন্ধ্যা)

ভাব চিত্র— উদার মলয় নিঃস্ব আজি/সামনে শুধু ধূসর বালুচর
পঞ্চতপা দিক্ বিধবার/বসনখানি লুটছে নিরন্তর!

(দ্বিপ্রহরে)

এখানে, চিত্র যে ভাব প্রকাশের কতখানি সহায় তা নূতন করে আবার জানি। চোখে দেখাই এখানে সবটুকু নয়, অলঙ্কারের

প্রয়োগও আসল আকর্ষণ নয়, কবির অনুভবের গাঢ়তাই চিত্রকে অবলম্বন করে একটি মনের স্পর্শ হয়ে ওঠে। অন্যদিক দিয়েও তুলনাটি স্পষ্ট করা যায়, সত্যেন্দ্রনাথ যখন ফ্যান্সিকে নির্ভর করে কবিতা লেখেন (যেমন বিদ্যুৎপর্ণা, লালপরী, নীলপরী প্রভৃতি) তখনও 'ইমেজ'-এর আভাস পাই, কিন্তু তার সঙ্গে যতীন্দ্রমোহনের 'ইমেজ'-এর পার্থক্য আছে; যতীন্দ্রমোহনের 'ইমেজ'-এর জন্ম 'ইম্যাজিনেসনে'র একান্ত নির্ভরতায়।; যেহেতু 'The imagery patterns life, and is a notation of it. It provides a notation for the significant elements in an experience; it maps the landmarks in a certain country. This is where the Fanay appears to fail. Its lack of an organic self-consistency is its main distinguishing characteristic.' [১০]

চিত্রকল্পের মধ্যে কবি ব্যক্তিত্বের প্রকাশ; যতীন্দ্রমোহনের রচিত চিত্রকল্প তাই কবির সৌন্দর্যমুগ্ধ রোমান্টিক দৃষ্টিতে, তাঁর হৃদয়-ধর্মের সোচ্চার প্রকাশে, তাঁর জীবনানুরাগের গভীর প্রত্যয়ে একটি অখণ্ডতা অর্জন করেছে, বহিরঙ্গ পরিচয়ে যা উজ্জ্বল, অন্তরঙ্গ পরিচয়ে যা প্রসন্ন-মধুর।—

ক। তুমি সন্ধ্যা আমার সঙ্গী—কেননা
প্রলয় অন্ধকার—
এই মুকুলিতা নব কলিকা-জীবনে
গন্ধ বন্ধ যার। (সন্ধ্যামণি)

খ। গন্ধ-ব্যাকুল কত কস্তুরী মুগ্ধ করে এ মন,
মৃগয়া-বিলাসী গলে পরে আসি আপনারই বন্ধন। (মায়ামৃগ)

গ। জুড়াল জ্বরের দাহ যেন সর্বদেহে
প্রকৃতির মন্ত্র-পড়া স্নিগ্ধ অবলেহে।
ক্লান্ত মন যন্ত্রণায় শান্তি পেল ধীরে,—
ঝঞ্চাহত পক্ষী যেন সান্ত্বনার নীড়ে। (উৎসবান্তে)

ঘ। কত আঁধি-রাতে দুটি আঁখি পাতে
আলেয়ার আলো জ্বালি'
কত না পথিকে ভুলায়ে বিদিকে
দিলে হাসে' করতালি! (বাসবদত্তা)

৫.

কবিতার বিচারে ভাষার আলোচনা মূল্যবান সন্দেহ নেই, কিন্তু ছন্দের মূল্য ততোধিক। অবশ্যই স্বীকার্য, ছন্দ কেবল শিশুর কর্ণেন্দ্রিয়ের তৃপ্তি বিধায়ক নয়, অথবা ছন্দ শুধু 'সাহিত্যের একটা কৃত্রিম প্রথা' নয়। 'কথাকে ভাব জড়ধর্ম থেকে মুক্তি দেবার জন্যেই ছন্দ।'[১১] কবি ছন্দকে তৈরী করেন একথা যতখানি সত্য, ছন্দ ভাব-বস্তুর স্বয়ংসৃষ্ট, একথাও ততখানি সত্য। ছন্দ কবির মনের আবেগকে পাঠকের মনে সঞ্চারিত করে দেয়। সুতরাং ছন্দের জন্ম আবেগ থেকেই। আবেগের যথার্থতায় যেমন চিত্রকল্পের সিদ্ধি, তেমনি ছন্দেরও পরম সার্থকতা তার মধ্যে। সুতরাং ছন্দ যেখানে দুর্বল আর জড়িমাক্লিষ্ট, সেখানে প্রকারান্তরে ভাবের অগভীরতা এবং অসত্য প্রমাণিত হয়। সমালোচক মহলে এ ব্যাপারে অন্যমতও আছে; কিন্তু আধুনিক কাব্যপাঠক ভাবের দীনতাকে যদি বা ক্ষমা করে, ছন্দের শিথিলতাকে কোনো ক্রমেই ক্ষমা করতে পারে না। বিশেষতঃ রবীন্দ্র-যুগে ছন্দ, মিল, ভাষা, উপমা, বিচিত্র রকম স্তবকবিন্যাসের সবক্ষেত্রে যে পরিণতিতে আমরা অভ্যস্ত, তাতে কুমুদরঞ্জন-করুণানিধানের কবিতার ছন্দ পতন শুধু কানকে আহত করে না, কবিতা সম্বন্ধে আমাদের স্বাভাবিক প্রত্যাশাকেও বিপর্যস্ত করে। আর সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, যিনি সারাজীবন শুধু ছন্দ নিয়ে নানা পরীক্ষাই করলেন, তাঁর কবিতাতে ছন্দ শুধু মাত্র 'কর্ণসংযোগ'ই দাবি করে। আধুনিক সমালোচক তাই অত্যন্ত তীব্র ভাষায় মন্তব্য করেন: "কথাটা এই যে, ভালো কবি না-হলে ভালো ছন্দও লেখা যায় না; যিনি যত বড়ো কবি কলাকৌশলেও

তত বড়োই অধিকার তাঁর ; আর যিনি শুধু ছন্দ লেখেন, আর সেই জন্যই 'ছন্দোরাজ' আখ্যা পেয়ে থাকেন, তাঁর কাছে—শেষ পর্যন্ত—ছন্দ বিষয়েও শেখবার কিছু থাকে না।"[১২] যতীন্দ্রমোহন এই দিক দিয়ে বিরল ব্যতিক্রম, যিনি 'ভাবে'র জন্য ভাষা-ছন্দকে বিসর্জন দেননি, আবার 'ছন্দের জন্য ছন্দ' রচনা করবার শিশুসুলভ চাপল্যও দেখান নি। প্রকৃতপক্ষে ছন্দের ক্ষেত্রেই রবীন্দ্রনাথের প্রভাব যতীন্দ্রমোহনের উপর সবাপেক্ষা ব্যাপক ও গভীর।

ছন্দ যে ভাব প্রকাশের সহায় একথা রবীন্দ্রনাথ বারংবার বলেছেন। সুতরাং আমরা যখন তিন জাতের ছন্দের বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করি, তখন তা শুধু 'টেক্‌নিক্যাল' কাব্য-রূপের বিচার নয়। আসলে তা রস-রূপেরই পরিচয়। তানপ্রধান ছন্দ গভীর এবং গম্ভীর ভাব প্রকাশের সহায় ; সমগ্র চরণ ব্যাপী সুরের টান, ধ্বনিময় যুক্তবর্ণের একমাত্রা রূপে ব্যবহার ও ফলে স্বচ্ছন্দ উচ্চারণ, পদের স্বাভাবিক দীর্ঘতা, —সব মিলিয়ে একটা বিশেষ ভাব-পরিবেশ সৃষ্টি হয়।

ক। সুবর্ণাভ বরদেহে বর্ণ তব কষিত কাঞ্চন,
বিপুল বাহুর শক্তি প্রচ্ছন্ন প্রমত্ত প্রভঞ্জন,
আনত আপন বীর্যে ; সর্জসম দৃপ্ত সরলতা
জানায় নিখিল চক্ষে দূর হতে বলিষ্ঠ বারতা। (ভীম)

খ। —মনে হল, তুমি যেন সন্তর্পণে আসি
নতনেত্রে ফুলটিরে নিলে ভালবাসি
হাত হতে। তার পরে, অভ্যস্ত ধরণে
চক্ষু মুদি অর্পিলে তা শিবের চরণে। (বিয়োগিনী)

এখানে শুধু পয়ার (তানপ্রধান) ছন্দের সাবলীলতাই লক্ষণীয় নয়, রবীন্দ্রনাথ-সংস্কৃত প্রবহমান পয়ারছন্দের স্বচ্ছন্দ ব্যবহারও বিশেষ প্রশংসার যোগ্য। কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও পয়ার যতীন্দ্রমোহনের একান্ত কাব্য-বাহন নয়।

বর্তমান শতাব্দীর প্রথম তিনদশকে সত্যেন্দ্রনাথের প্রভাবই ছন্দের ক্ষেত্রে দূরপ্রসারী, এবং মোহিতলাল এমনকি বুদ্ধদেব বসু পর্যন্ত সেই ললিত কোমল ছন্দের দ্রুত উত্থান-পতনে সাময়িকভাবে নিমজ্জিত হয়েছেন। সত্যেন্দ্রনাথ দেশজ বা প্রাকৃত ছন্দকেই উদ্ধার করলেন, প্রতিষ্ঠিত করলেন রোমান্টিক কবিকল্পনার উচ্চভূমিতে, এবং ছড়ার ছন্দ শুধু লোকসাহিত্য বা শিশুসাহিত্যর সংকীর্ণ গণ্ডীতে আবদ্ধ রইলো না। অবশ্য সত্যেন্দ্রনাথের কৃতিত্ব শুধু শ্বাসাঘাতপ্রধান ছন্দের নিপুণ ব্যবহারে নয়; ধ্বনিপ্রধান বা মাত্রাবৃত্ত ছন্দে শ্বাসাঘাতের প্রয়োগ আরও বিস্ময়কর। তারাপদ ভট্টাচার্য একে 'বলবৃত্তবেশী মাত্রাবৃত্ত ছন্দ' বলেছেন। যতীন্দ্রমোহন সত্যেন্দ্রনাথের অনুকরণে 'ঝরণাধারা'র মত কবিতা কদাচিৎ লিখেছেন—

কিঙ্কিণী কঙ্কণ রামধনু রং কোন্।
বালা আর চুড়ীতে বাজে শিলাঘুড়িতে,
খেলিতেছে ঝম্পাই আস্‌মান কম্পাই।

কিন্তু এখানে যতীন্দ্রমোহন শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়েছেন। শ্বাসাঘাতের অত্যধিক ব্যবহার তাঁর স্বভাববিরুদ্ধ; আসলে সত্যেন্দ্রনাথের 'ফ্যান্সী' ধর্মী চিত্রে যে চলচিত্রতার লক্ষণ পরিস্ফুট, তাতে গতির প্রয়োজন অত্যন্ত বেশী, যতীন্দ্রমোহনের ভাবধর্মী কবিতায় সেই দ্রুততা মনঃবিক্ষেপের কারণ। তবে শ্বাসাঘাতপ্রধান ছন্দ রবীন্দ্রনাথ 'পলাতকা'য় কিংবা 'বলাকা'য় যে ভাবে ব্যবহার করেছেন, যাকে বলতে পারি, প্রবহমান শ্বাসাঘাতপ্রধান ছন্দ, যতীন্দ্রমোহন তাতে অনেক স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করেছেন।

এদিক ওদিক কোথাও সে নাই, মাসে মাসে বছর গেল কেটে—
শ্রাবণ-ধারায় ভিজে ভিজে, চোৎ-বোশেখে শুক্‌নো মাটি ফেটে!
যদিই থাকে বেচেঁ
দিদি, তোরা দেখিস শুধু পাগলাটা মোর আসে না ফের যেচে।

(আশঙ্কা)

আধুনিক কালে এই ছন্দেরই নানা প্রয়োগ পরীক্ষা হচ্ছে। কিন্তু যতীন্দ্রমোহনের নিজস্ব ছন্দ ধ্বনিপ্রধান। ধ্বনিপ্রধান ছন্দেই তিনি নিজেকে প্রকাশ করতে পারেন, আসলে ধ্বনিপ্রধান ছন্দই চিত্র ও চরিত্র রচনায় সর্বাপেক্ষা উপযোগী। ড্রামাটিক মোনোলগের সাবলীলতা হয়তো পয়ার ছন্দেও সম্ভব, কিন্তু সেখানে বাক্‌ছন্দকে আয়ত্ত করা দুরূহ। 'শবরীর প্রতীক্ষা'য় পয়ার ছন্দ পৌরাণিক গাম্ভীর্যকে ফোটাতে সাহায্য করেছে, কিন্তু 'দুর্যোধন' বা 'কর্ণে'র মত আধুনিক চরিত্র কিংবা 'অন্ধবধূ' বা 'কাজ্‌লাদিদি'র মত অন্তরঙ্গ চরিত্রকে প্রকাশ করার জন্য ধ্বনিপ্রধান ছন্দই একমাত্র অবলম্বন। এবং লক্ষ্য করতে হবে, ধ্বনিপ্রধান ছন্দের ক্ষেত্রেও যতীন্দ্রমোহন চরণের প্রবহমানতাকে রক্ষা করার চেষ্টা করেছেন, এবং সেই দিক দিয়ে এই ছন্দ কবি-ভাষাকে অনেকখানি নাটকীয়তা দিয়েছে।

ঐ চেয়ে দেখ্‌,—পূব তোরণে
ফুটিছে উষার রক্তরাগ—
ওরে মন, তুই জাগি সাথে আজ
আপনার মাঝে জাগ্‌বে জাগ্‌, (ব্রাহ্মমুহূর্তে)

অবশ্যই একে পুরোপুরি 'মুক্তক মাত্রাবৃত্ত' বলবো না। রবীন্দ্রনাথ এই 'তিন মাত্রা'র ছন্দের অতি-চাঞ্চল্য লক্ষ্য করে তার পক্ষে অমিত্রাক্ষরের মত যথেচ্ছ থামা অসম্ভব বিবেচনা করেছিলেন। কিন্তু একেবারে অসম্ভব যে নয়, যতীন্দ্রমোহন বহু স্থলে তার পরীক্ষা করেছেন, হয়তো সাফল্য সীমাবদ্ধ এইটুকু বলতে পারি।

ক। অন্নপূর্ণা পারে মিটাতে
ক্ষুধা তার, যে বা অন্নহীন,—
কুবের যাহার ভাণ্ডারী—সেই
চির ভিক্ষুক জন্মদীন। (হর-পার্বতী)

খ। —ওহো সেই কথা? দ্যূত-ক্রীড়ার
ক্ষত্রাধিকার বিদিতলোকে,—
কে বলিবে পাপ? কোন অনুতাপ-
বাষ্প তা লাগি নাহি এ চোখে! (দুর্যোধন)

এখানে দ্বিতীয় দৃষ্টান্তে স্পষ্টতঃ ধ্বনিপ্রধানকে প্রবহমান করতে গিয়ে কবি অপঘাত ঘটিয়েছেন। আসলে ধ্বনিপ্রধান ছন্দের প্রবহমানতা কিছুক্ষণের জন্য সম্ভব, 'কিন্তু একটানা বেশীক্ষণ, স্বাচ্ছন্দ্য রক্ষা করা তার পক্ষে দুরূহ। কেননা পদাতিকের চেয়ে নর্তকের বিশ্রামের প্রয়োজন বেশী, এমনকি দৌড়ওলার চাইতেও।'[১৩] যতীন্দ্রমোহনের চেষ্টাটাই এখানে উল্লেখযোগ্য; তিনি সত্যেন্দ্রনাথের মত ছন্দ-সিদ্ধি লাভ করেননি বটে, কিন্তু তাঁর ছন্দের কান ছিল, বিশেষ ভাবের উপযোগী বিশেষ ছন্দ নির্বাচনেও তাঁর স্বাভাবিক দক্ষতা ছিল, ভাষার উপরে অধিকার ছিল সুনিশ্চিত, যাতে মিলগুলি এসেছে আকস্মিক অথচ অনিবার্য। দক্ষ শিল্পী এবং হৃদয়বান কবি,—এই উভয় পরিচয়ের সম্মিলনে যতীন্দ্রমোহন বড় কবি না হয়েও, বিশিষ্ট কবি: উত্তর-রবীন্দ্র আধুনিকতার ধ্বজাবাহক না হয়েও রবীন্দ্র-প্রভাবের স্বীকরণে এবং নিজত্ব রক্ষার সামর্থ্যে রবীন্দ্রযুগের অন্য কবিদের মধ্যে একক স্বতন্ত্র একটি কবি-ব্যক্তিত্বের অধিকারী।

১। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত: 'কাব্যের মুক্তি'। স্বগত (১৩৬৪) পৃ: ২৪-২৫

২। শঙ্খ ঘোষ: 'কাব্যনাট্য'। সাহিত্যকোষ-নাটক (১৯৬৩) পৃ: ২০।

৩। 'The dramatic monologue is a character sketch, or a drama condensed into a single episode, presented in a one-sided conversation by one person to another or to a group, e.g. *My Last Duchess*; *Andrea del Sarto*.' (Ed) Joshep T. Shipley: Dictionary of World Litrerary Terms (London 1955) পৃ: ২৭৩।

৪। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, 'কাব্যের মুক্তি'। স্বগত। পৃ: ২৯।

৫। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়: ইংরাজী সাহিত্যের ইতিহাস (১৯৬০) পৃ: ১৯৭।

৬। C. Day Lewis: The Poetic Image (London 1948) পৃ: ২৪।

৭। ঐ ঐ পৃ: ২২।

৮। I. A. Richards : Principles of Literary Criticism (1961 Routledge Paperback) পৃ: ১১৯। দ্র: 'Too much importance has always been attached to the sensory qualities of images. What gives an image efficacy is less its vividness as an image than its character as a mental event peculiarly connected with sensation.'

৯। Rene Wellek & Austin Warren : Theory of Literature (1963, Peregrine Books) পৃ: ১৮৮।

১০। Robin Skelton : The Poetic Pattern (London 1956 .)

১১। রবীন্দ্রনাথ : 'ছন্দের অর্থ'।

১২। বুদ্ধদেব বসু : 'রবীন্দ্রনাথ ও উত্তরসাধক'। সাহিত্যচর্চা

১৩। ঐ 'বাংলা ছন্দ'। ঐ পৃ: ৮৫।